নির্ব্বাসিতের আত্মকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দুই টাকা

তৃতীয় সংস্করণ

আষাঢ়, ১৩৫২

বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষে প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কে, ভি, আপ্পারাও কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড হইতে মুদ্রিত।

ভূমিকা

বাংলায় বা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যে সমস্ত যুবক ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, সরকারী কাগজপত্রে ও ইংরাজী সংবাদপত্রে তাহাদিগকে 'আনারকিষ্ট' (anarchist) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যাহারা সর্ব্ববিধ শাসনপ্রণালীর বিরোধী, ইংরাজীতে তাহাদিগকেই আনারকিষ্ট বলে। এরূপ কোনও দল ভারতবর্ষে আছে বা ছিল বলিয়া আমি জানি না। যে সমস্ত পরাধীন দেশে লোকমত প্রভাবে বিদেশীয় শাসনযন্ত্র পরিবর্ত্তিত করিবার উপায় নাই, সে সমস্ত দেশে স্বাধীনতাস্পৃহা জাগিয়া উঠিলে গুপ্ত সভা-সমিতির সৃষ্টি অনিবার্য্য। ইটালী, পোলাণ্ড, আয়র্লণ্ড প্রভৃতি দেশে যে সমস্ত কারণে বিপ্লবপন্থীদিগের আবির্ভাব হইয়াছিল, ভারতবর্ষে সেই কারণগুলি সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই এখানেও বিপ্লবাগ্নির স্ফুলিঙ্গ দেখা দিয়াছিল। আমাদের শাসকসম্প্রদায়ও সে কথা বেশ ভাল করিয়া জানেন বলিয়াই তাড়াতাড়ি রিফর্ম বিলের শান্তিজল ছিটাইয়া দিয়া সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল কি ব্যর্থ হইয়াছে তাহা বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার শুধু এইটুকুই বক্তব্য যে এদেশের বিপ্লবপন্থীরা আনারকিষ্ট নহেন! বিপ্লবসমিতিগুলির ইতিহাস যাঁহারা জানেন তাঁহারাই এ কথা স্বীকার করিবেন। সে কথা প্রমাণ করিবার জন্য অতীতের অন্ধকারময় গহ্বর হইতে সে বিস্মৃত ইতিহাস আপাততঃ টানিয়া বাহির করিবার আবশ্যকতা নাই। বাঙালীদের আত্মসম্মানবোধ রাজপুরুষদিগের

ব্যবহারে প্রতিপদে ক্ষুন্ন হইতেছিল বলিয়াই, ইংরাজাধিকারে তাঁহাদের মনুষ্যত্ব লাভের সম্ভাবনা ছিল না বলিয়াই বাঙালীরা তাহাদের ক্ষীণ প্রাণের সমগ্র শক্তি একত্র করিয়া ইংরাজের দুর্জ্জয় শক্তি প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্য গুপ্ত সভা-সমিতি স্থাপনের চেষ্টা না হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু তাহা কার্য্যতঃ বিশেষ ফলদায়ী হয় নাই। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত বাংলাদেশ লর্ড কর্জ্জনকৃত অপমানে যে বাত্যা-বিক্ষুব্ধ সাগরবক্ষের মত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল সেই চাঞ্চল্য হইতে প্রকৃতপক্ষে বাংলায় বিপ্লববাদের উৎপত্তি। দেশের মধ্যে তখন যে প্রবল উত্তেজনা-স্রোত বহিতেছিল তাহাই আধার বিশেষে ঘূর্ণ্যাবর্ত্তে পরিণত হইয়া বিপ্লবকেন্দ্রের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। 'যুগান্তর' ছিল ঐরূপ একটি বিপ্লবকেন্দ্রের মুখপত্র। ঐ সংবাদপত্রের পরিচালকগণের সংস্রবে আসিয়াই আমি বিপ্লবীদলে যোগ দিয়াছিলাম।

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তখন শীতকাল। আসর বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছে। উপাধ্যায় মহাশয় সবে মাত্র 'সন্ধ্যা'য় চাটিম চাটিম বুলি ভাঁজিতে আরম্ভ করিয়াছেন; অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষার জন্য বরোদার চাকরী ছাড়িয়া আসিয়াছেন; বিপিন বাবুও পুরাতন কংগ্রেসী দল হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন; সারা দেশটা যেন নূতনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। আমি তখন সবেমাত্র সাধুগিরির খোলস ছাড়িয়া জোর করিয়া মাষ্টারীতে মনটা বসাইবার চেষ্টা করিতেছি এমন সময় এক সংখ্যা "বন্দে মাতরম্" হঠাৎ একদিন হাতে আসিয়া পড়িল। ভারতের রাজনৈতিক আদর্শের কথা আলোচনা করিতে করিতে লেখক বলিয়াছেন—"We want absolute autonomy free from British control." আজকাল এ কথাটা হাটে মাঠে ঘাটে বাজারে খুব সস্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু সেকালে বড় বড় রাজনৈতিক পাণ্ডারাও মুখ ফুটিয়া কথাটা বাহির করিতেন না। একেবারে ছাপার অক্ষরে ঐ কথাগুলা দেখিয়া আমার মনটা তড়াং করিয়া নাচিয়া উঠিল। সেকালের নেতারা ভাজিতেন ঝিঙ্গা, আর বলিতেন পটোল। যখন Self-government সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন, তখন তাহার পিছনে colonial কথাটা জুড়িয়া দিয়া শ্যাম ও কুল দুইই রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহাতে আইনও বাঁচিত, হাততালিও পড়িত।

কিন্তু আমার কেমন পোড়া অদৃষ্টের লিখন! ঐ ছাপার অক্ষর-গুলা ভোঁ ভোঁ করিয়া কানের ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে একেবারে মাথায় চড়িয়া বসিল। মনটা কেবল থাকিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল—"আরে ওঠ, ওঠ, সময় যে হয়ে গেল!" সেরাত্রে আর ঘুম হইল না। শুইয়া শুইয়া স্থির করিলাম, এসব কথার মূলে কিছু আছে কিনা খোঁজ লইতে হইবে। সত্যই কি এর সবটা শুধু বচন? খোঁজ লইতে বাহির হইয়া যে সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত গুজব শুনিলাম, তাহাতে চক্ষু স্থির হইয়া গেল। পাহাড়ের কোন্ নিভৃত গহ্বরে বসিয়া নাকি লাখ দুই নাগা সৈন্য তলোয়ার সানাইতেছে; হাতিয়ার সবই মজুত, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশও নাকি প্রস্তুত; শুধু বাংলা পিছাইয়া আছে বলিয়া তাহারা কাজে নামিতে একটু বিলম্ব করিতেছে। হবেও বা।

সেই সময় কলিকাতা হইতে "যুগান্তর" কাগজখানা বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে। লোকে কানাকানি করে যে যুগান্তরের আড্ডাটা নাকি একটা বিপ্লবের কেন্দ্র। বিপ্লবের নাম শুনিয়াই অনেক যুগের সঞ্চিত রোমান্স আমার মনের মধ্যে ঢেউ খেলিয়া উঠিল; ফ্রান্সের রবসপিয়েরে হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দমঠের জীবানন্দ পর্য্যন্ত সবাই এক একবার মনের মধ্যে উঁকি মারিয়া গেল। এ দেশে যাহারা বিপ্লব আনিবে, ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের যাহারা মূর্ত্ত বিগ্রহ সেগুলি কি রকমের জীব তাহা দেখিবার বড় আগ্রহ হইল। আমি ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব, আর পাঁচজনে মিলিয়া রাতারাতি ভারতটাকে স্বাধীন করিয়া লইবে, এতো আর সহ্য করা যায় না!

কলিকাতার যুগান্তর অফিসে আসিয়া দেখিলাম ৩।৪টি যুবক মিলিয়া একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া ভারত উদ্ধার করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধের আসবাবের অভাব দেখিয়া মনটা একটু দমিয়া গেল

বটে, কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য। গুলি-গোলার অভাব তাঁহারা বাক্যের দ্বারাই পূরণ করিয়া দিলেন। দেখিলাম, লড়াই করিয়া ইংরেজকে দেশ হইতে হটাইয়া দেওয়া যে একটা বেশী কিছু বড় কথা নয়, এবিষয়ে তাঁহারা সকলেই একমত। কাল না হয় দুদিন পরে যুগান্তর আফিসটা যে গবর্ণমেণ্ট হাউসে উঠিয়া যাইবে, সেবিষয়ে কাহারও সন্দেহমাত্র নাই। কথায়, বার্ত্তায়, আভাষে, ইঙ্গিতে এই ধারণাটা আমার মনে আসিয়া পড়িল যে, এসবের পশ্চাতে একটা দেশব্যাপী বড় রকমের কিছু প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।

দুই চারিদিন আনাগোনা করিতে করিতে ক্রমে "যুগান্তরের" কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইল। দেখিলাম—প্রায় সকলেই জাতকাট ভবঘুরে বটে। দেবব্রত (ভবিষ্যতে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নামে ইনি প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন) বি-এ পাস করিয়া আইন পড়িতেছিলেন; হঠাৎ ভারত উদ্ধার হয়-হয় দেখিয়া আইন ছাড়িয়া "যুগান্তরের" সম্পাদকতায় লাগিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভুপেনও সম্পাদকদের মধ্যে একজন। অবিনাশ এই পাগলদের সংসারে গৃহিণী-বিশেষ। যুগান্তরের ম্যানেজারি হইতে আরম্ভ করিয়া ঘর-সংসারের অনেক কাজের ভারই তাহার উপর। বারীন্দ্রের সহিত আলাপ হইতে একটু বিলম্ব হইল, কেন না সে তখন ম্যালেরিয়ার জ্বালায় দেওঘরে পলাতক। পরে তাহার হাড় ক'খানার উপর চামড়া জড়ানো শীর্ণ শরীর, মাঠের মত কপাল, লম্বা লম্বা বড় বড় চোখ, আর খুব মোটা একটা নাক দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম যে, কল্পনা ও ভাবের আবেগে যাহারা অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তোলে বারীন্দ্র তাহাদেরই একজন। অঙ্কশাস্ত্রের জ্বালায় কলেজ ছাড়িয়া অবধি সারেঙ্গ বাজাইয়া, কবিতা লিখিয়া, পাটনায় চায়ের দোকান খুলিয়া এযাবৎ অনেককীর্ত্তিই সে

করিয়াছে। বড় লোকের ছেলে হইয়াও বিধাতার কৃপায় দুঃখ-দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। এইবার ৫০৲ টাকা পুঁজি লইয়া যুগান্তর চালাইতে বসিয়াছে। দেখা হইবার পর তিন কথায় সে আমাকে বুঝাইয়া দিল যে, দশ বৎসরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হইবেই হইবে।

ভারত-উদ্ধারের এমন সুযোগ ত আর ছাড়া চলে না! আমিও বাসা হইতে পুঁটলী-পাঁটলা গুটাইয়া যুগান্তর আফিসে আসিয়া বসিলাম।

কিছুদিন পরে দেবব্রত 'নবশক্তি' আফিসে চলিয়া গেল। ভূপেনও পূর্ব্ববঙ্গে ঘুরিতে বাহির হইল। সুতরাং যুগান্তর সম্পাদনের ভার বারীন্দ্র ও আমার উপরেই আসিয়া পড়িল। আমিও "কেষ্ট বিষ্টু"দের মধ্যে একজন হইয়া দাঁড়াইলাম।

বাংলার সে একটা অপূর্ব্ব দিন আসিয়াছিল। আশার রঙ্গীন নেশায় বাঙ্গালীর ছেলেরা তখন ভরপুর। "লক্ষ পরাণে শঙ্কা না মানে, না রাখে কাহারো ঋণ।" কোন্ দৈব স্পর্শে যেন বাঙ্গালীর ঘুমন্ত প্রাণ সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল। কোন্ অজানা দেশের আলোক আসিয়া তাহার মনের যুগযুগান্তের আঁধার যেন মুছিয়া দিয়াছিল। "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।"—রবীন্দ্র যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা সেই সময়কার বাঙালী ছেলেদের ছবি। সত্যসত্যই তখন একটা জ্বলন্ত বিশ্বাস আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। আমরাই সত্য; ইংরেজের তোপ, বারুদ, গোলাগুলি, পল্টন, মেসিনগান – ওসব শুধু মায়ার ছায়া! এ ভোজবাজীর রাজ্য, এ তাসের ঘর—আমাদের এক ফুৎকারেই উড়িয়া যাইবে। নিজেদের লেখা দেখিয়া নিজেরাই চমকিয়া উঠিতাম; মনে হইত যেন দেশের প্রাণ-পুরুষ আমাদের হাত দিয়া তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিতেছেন।

হু হু করিয়া দিন দিন যুগান্তরের গ্রাহকসংখ্যা বাড়িয়া যাইতে

লাগিল। এক হাজার হইতে পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার, দশ হাজার হইতে এক বৎসরের মধ্যে বিশ হাজারে ঠেকিল। ছোট প্রেসে ত আর অত কাগজ ছাপা চলে না। লুকাইয়া অন্য প্রেসে ছাপান ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না।

ঘরের কোণে একটা ভাঙ্গা বাক্সে যুগান্তর বিক্রয়ের টাকা থাকিত। তাহাতে চাবি লাগাইতে কখন কাহাকেও দেখি নাই। কত টাকা আসিত আর কত টাকা খরচ হইত, তাহার হিসাবও কেহ লইত না। যুগান্তর আফিসে অনেকগুলি ছেলেও মাঝে মাঝে আসিয়া খাইত ও থাকিত। তাহাদের বাড়ী কোথায়, তাহারা কি করে, এসংবাদ বড় কেহ রাখিত না। এইটুকু শুধু জানিতাম যে, তাহারা "স্বদেশী"; সুতরাং আমাদের আত্মীয়।

বাহিরে যাইবার সময় বাড়ীর সুমুখে দুই একটী লোককে প্রায়ই দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতাম, আমাদের দেখিলে তাহারা কেহ আকাশ পানে চাহিত, কেহ সম্মুখের চায়ের দোকানে ঢুকিয়া পড়িত, কেহ বা শীস দিতে দিতে চলিয়া যাইত। শুনিতাম— সেগুলি নাকি সি-আই-ডির অনুগৃহীত জীব। সি—আই—ডি! ফুঃ! কে কার কড়ি ধারে?

দিন এইরূপে কাটিতে লাগিল। একদিন সরকার বাহাদুরের তরফ হইতে একখানা চিঠি আসিয়া হাজির হইল যে, যুগান্তরে যেরূপ লেখা বাহির হইতেছে তাহা রাজদ্রোহ-সূচক। ভবিষ্যতে ওরূপ করিলে আইনের কবলে পড়িতে হইবে। আমরা ত হাসিয়াই অস্থির! আইন কিরে, বাবা? আমরা ভারতের ভাবী সম্রাট, গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তরাধিকারী—আমাদের আইন দেখায় কেটা?

একদিন কিন্তু সত্য সত্যই পালে বাঘ পড়িল। ইন্সপেক্টর পূর্ণ লাহিড়ী জনকতক কন্সটেবল্ লইয়া যুগান্তর আফিসে খানাতল্লাসী করিতে

আসিলেন। যুগান্তরের সম্পাদককে গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানাও তাঁহার সঙ্গে ছিল। কিন্তু সম্পাদক কে? এ বলে 'আমি', ও বলে 'আমি'। শেষে ভূপেনই একটু মোটা-সোটা ও তাহার বেশ মানানসই রকমের দাড়ি আছে বলিয়া, তাহাকেই সম্পাদক বলিয়া স্থির করা হইল। ভূপেন যখন আদালতে সাফাই গাহিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিল না তখন দেশে ছেলে ছোকরাদের মধ্যে একটা খুব হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এ কাণ্ডটা নূতন আজগুবী কাণ্ড বটে! ভূপেন যাহাতে ক্রটী স্বীকার করিয়া নিষ্কৃতি পায়, সরকারী পক্ষ হইতে সে চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু ভূপেন রাজী হইল না। ফলে ম্যাজিষ্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ড তাহাকে এক বৎসরের জন্য জেলে ঠেলিয়া দিলেন।

এই সময় হইতে দেশে রাজদ্রোহের মামলার ধূম লাগিয়া গেল। দুই সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই যুগান্তরের উপর আবার মামলা সুরু হইল এবং যুগান্তরের প্রিণ্টার বসন্তকুমারকে জেলে যাইতে হইল।

একে একে এরূপ অনেকগুলি ছেলে জেলে যাইতে লাগিল। তখন বারীন্দ্র বলিল—"এরূপ বৃথা শক্তিক্ষয় করিয়া লাভ নাই। বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে ধরাশায়ী করিবার কোনও সম্ভাবনা দেখি না। এতদিন যাহা প্রচার করিয়া আসিলাম, তাহা এইবার কাজে করিয়া দেখাইতে হইবে।" এই সঙ্কল্প হইতেই মাণিকতলার বাগানের সৃষ্টি।

মাণিকতলায় বারীন্দ্রদের একটা বাগান ছিল। স্থির হইল যে, একটা নূতন দলের উপর যুগান্তরের ভার দিয়া যুগান্তর আফিসের জনকত বাছাই বাছাই ছেলে লইয়া ঐ বাগানে একটা নূতন আড্ডা গড়িতে হইবে। যাহাদের সংসারের টান নাই, অথবা টান থাকিলেও অকাতরে তাহা বিসর্জ্জন দিতে পারে, এরূপ ছেলেই লইতে হইবে।

কিন্তু ধর্ম্ম-জীবন লাভ না হইলে এরূপ চরিত্র প্রায় গড়িয়া উঠে না ; সেই জন্য স্থির হইল যে, বাগানে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমি তখন সাধুগিরির ফেরত আসামী ; সুতরাং পুঁথিগত মামুলী ধর্ম্ম শিক্ষার উপর আমার যে বড় একটা গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তা নয়। বারীন্দ্র কিন্তু নাছোড়বান্দা। গেরুয়ার উপর তাহার তখন অসীম ভক্তি। একজন ভাল সাধু-সন্ন্যাসীকে ধরিয়া আমাদের দলে পুরিতে পারিলে তাহার শিক্ষায় দীক্ষায় যে ছেলেদের ধর্ম্মজীবনটা গড়িয়া উঠিবে, এই আশায় সে সাধু খুঁজিতে বাহির হইয়া পড়িল। কি করিব, সঙ্গে আমিও চলিলাম। কিন্তু যাই কোথা? আমাদের পাল্লায় পড়িবার জন্য কোথায় সাধু বসিয়া আছে? বরোদায় থাকিবার সময় বারীন্দ্র শুনিয়াছিল যে, নর্ম্মদার ধারে কে নাকি একজন ভাল সাধু আছে। অতএব চলো সেইখানে। তাহাই হইল। কিন্তু যে আশা লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহা মিটিল না। সাধুজী তাঁহার কাটা জিহ্বাটী উল্টাইয়া তালুতে লাগাইয়া দমবন্ধ করিয়া থাকিতে পারেন। শুনিলাম—তিনি নাকি ঐরূপে ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ক্ষরিত সুধাধারা পান করিয়া থাকেন। বিশ পঞ্চাশ রকমের আসনও তিনি আমাদের বাৎলাইয়া দিলেন, রকম বেরকমের ধৌতি বস্তির কসরৎও দেখাইতে ভুলিলেন না। কিন্তু আমাদের পোড়া মন তাহাতে উঠিল না।

দুই তিন দিন বেশ মোটা মোটা ঘৃতসিক্ত রুটী ও অড়হর ডাল ধ্বংস করিয়া আমরা তাঁহার আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। বারীন্দ্র কিন্তু নিরুৎসাহ হইবার পাত্র নয়। আমায় বলিল—"দেখ গিরিডির কাছে কোথায় একজন সাধু আছেন শুনেছি। তুমি একবার সেইখানে গিয়ে খোঁজ কর ; আর রাস্তায় কাশীতেও একবার ঢু মেরে যেয়ো। আমি এই অঞ্চলে আরও দিন কতক দেখি।" আমি 'তথাস্তু'

বলিয়া গিরিডি যাত্রার নাম করিয়া সটান মাণিকতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দিন কয়েক পরে শুনিলাম—বারীন আর একটা সাধুকে পাকড়াও করিয়াছে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তিনি ঝান্‌সীর রাণীর পক্ষ হইয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তারপর সাধু হইয়া চুপচাপ এতদিন সাধন-ভজন করিতেছিলেন। বারীন্দ্রের সংস্পর্শে আবার সেই বহুদিনের নির্ব্বাপিতপ্রায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বারীন্দ্র তাহাকে বলিল—"ঠাকুর, তুমি আমায় একখানা গেরুয়া কাপড় আর কানে যা হয় একটা মন্তর ফুঁকে দাও; বাকি সবটা আমিই করে নেব।" সাধু বারীনকে বড় ভালবাসিতেন; তিনি তাহাতেই রাজী হইলেন। বারীন সাধুর নিকট যথাশাস্ত্র মন্ত্রদীক্ষা লইল। কিছুদিন পরে বারীনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"সাধু কি মন্ত্র দিলেন?" বারীন্দ্র বলিল—"ভুলে মেরে দিয়েছি।" যাই হোক, বারীন্দ্র তাঁহাকে লইয়া মধ্যভারতের কোনও তীর্থস্থানে একটা আশ্রম গড়িবার সঙ্কল্প করে; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে জলাতঙ্করোগে বাবাজীর মৃত্যু হওয়ায় সে সংকল্প আর কাজে পরিণত হইল না।

কিছুদিন পরে বারীন্দ্র আর একজন সাধুর নিকট হইতে সাধন লইয়া দেশে ফিরিল। ঐ সাধুটী মধ্যভারত ও বোম্বাই অঞ্চলে একজন সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরে তাঁহাকে আমিও দেখিয়াছি। তিনি যে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বারীন্দ্র ফিরিয়া আসিবার পর একটা আশ্রম গড়িবার ঝোঁক আমাদের ঘাড়ে খুব ভাল করিয়াই চাপিল। কিন্তু মনের মত জায়গা মিলিল না। শেষে স্থির হইল, যতদিন না ভাল জায়গা পাওয়া যায় ততদিন মাণিকতলার বাগানেই আশ্রমের কাজ চলুক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাণিকতলার বাগানে যখন আশ্রমের সূত্রপাত হইল তখন সেখানে চার পাঁচ জনের অধিক ছেলে ছিল না। হাতে একটীও পয়সা নাই, ছেলেরা সকলেই বাড়ী ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে, সুতরাং তাহাদের মা বাপদের কাছ থেকেও কিছু পাইবার সম্ভাবনা নাই। অথচ ছেলেদের আর কিছু জুটুক আর নাই জুটুক, দুবেলা দু'মুঠো ভাত ত চাই! দু একজন বন্ধু মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, আর স্থির হইল যে, বাগানে শাকসব্জীর ক্ষেত করিয়া বাকী খরচটা উঠাইয়া লওয়া হইবে। বাগানে আম, জাম কাঁঠালের গাছও যথেষ্ট ছিল। সেগুলা জমা দিয়াও কোন্ না দু-দশ টাকা পাওয়া যাইবে? আর আমাদের খাইতেও বেশী খরচ নয়—ভাতের উপর ডাল আর একটা তরকারী। অধিকাংশ দিনই আবার ডালের মধ্যেই দুই চারিটা আলু ফেলিয়া দিয়া তরকারীর অভাব পুরাইয়া লওয়া হইত। সময়াভাব হইলে খিচুড়ীর ব্যবস্থা। একটা মস্ত সুবিধা হইল এই যে, বারীন তখন ঘোরতর ব্রহ্মচারী। মাছের আঁশ বা পেঁয়াজের খোসাটী পর্য্যন্ত বাগানে ঢুকিবার হুকুম নাই; তেল, লঙ্কা একেবারেই নিষিদ্ধ। সুতরাং খরচ কতকটা কমিয়া গেল।

উপার্জ্জনের আরও একটা পথ বারীন্দ্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিল—হাঁস ও মুরগী রাখা! কতকগুলা হাঁস ও মুরগী কেনাও হইয়াছিল কিন্তু দেখা গেল যে, তাহাদের ডিম ত পাওয়াই যায় না; অধিকন্তু তাহাদের সংখ্যা দিন দিন কমিতেছে। কতক শেয়ালে খায়, কতক বা লোকে চুরি করে। অধিকন্তু আমাদের পাড়াপড়শীদের আমাদের বাগানে মুরগী

রাখা সম্বন্ধে বিষম আপত্তি। একদিন একজন হাড়ি তাড়ি খাইয়া আসিয়া হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ হইতে দুই ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়া মুরগী পালনের যে রকম ভীষণ প্রতিবাদ করিয়া গেল, তাহাতে তাড়াতাড়ি মুরগী কয়টাকে বেচিয়া ফেলা ছাড়া আর আমাদের উপায়ান্তর রহিল না। হাড়ি বাবুটীর নাম ভুলিয়া গিয়াছি। তা' না হইলে ব্রাহ্মণসভায় লিখিয়া তাঁহাকে একটা উপাধি জোগাড় করিয়া দিতাম।

আমাদের বাজে খরচের মধ্যে ছিল চা। ওটা না থাকিলে সংসার নিতান্তই ফিকে ফিকে, অনিত্য বলিয়া মনে হইত। বিশেষতঃ বারীন চা বানাইতে সিদ্ধহস্ত। তাহার হাতের গোলাপী চা, ভাঙ্গা নারিকেলের মালায় ঢালিয়া চক্ষু বুজিয়া তারিফ করিতে করিতে খাইবার সময় মনে হইত যে, ভারত উদ্ধারের যে কয়টা দিন বাকি আছে, সে কয়টা দিন যেন চা খাইয়াই কাটাইয়া দিতে পারা যায়।

প্রথম দিনেই বারীন আইন জাহির করিয়া দিল যে, নিজে রাঁধিয়া খাইতে হইবে। এক আধ জন ত রাঁধিবার ভয়ে বাগান ছাড়িয়া পলাইয়া গেল! কিন্তু তা বলিয়া বাগানের ভিতর ত আর বাহিরের লোককে ঢুকিতে দেওয়া যায় না—বিশেষতঃ পয়সার অভাব। কিন্তু চিরদিন বাড়ীতে মায়ের হাতের আর মেসে ঠাকুরের হাতের রান্না খাইয়া আসিয়াছি। সাধুগিরির সময় ভিক্ষা করিয়া যা খাইয়াছি তাও পরের হাতের রান্না। আজ এ আবার কি বিপদ! পালা করিয়া প্রত্যহ দুই জনের উপর রান্নার ভার পড়িল। সুতরাং আমাকেও মাঝে মাঝে রন্ধন-বিদ্যা'র নিগূঢ় রহস্য লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হইত; কিন্তু ব্রাহ্মণের ছেলে হইলেও ও-বিদ্যাটা কখনও বড় বেশী আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই।

থালা, ঘটী, বাটীর নাম গন্ধ বাগানে বড় বেশী ছিল না। প্রত্যেকের

এক একটা নারিকেল মালা আর একখানা করিয়া মাটির সানকি ছিল; তাহাই আহারাদির পর ধুইয়া মুছিয়া রাখিয়া দিতে হইত। কাপড় সকলেই নিজের হাতে সাবান দিয়া কাচিয়া লইত; যাহারা একটু বেশী বুদ্ধিমান, তাহারা পরের কাচা কাপড় পরিয়াই কাজ চালাইয়া দিত।

ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশের নানা জেলা হইতে প্রায় ২০ জন ছেলে আসিয়া জুটিল। তাহাদের মধ্যে ৫।৭ জন অধিকাংশ সময় কাজকর্ম্ম লইয়া থাকিত আর যাহারা বয়সে একটু ছোট তাহারা প্রধানতঃ পড়াশুনা করিত। পড়াশুনার মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্র, রাজনীতি ও ইতিহাস চর্চ্চা, আর কর্ম্মের মধ্যে বিপ্লবের আয়োজন। অনেক রকম ছেলে আসিয়া আমাদের কাছে জুটিয়াছিল। কলেজী বিদ্যার হিসাবে কেহ বা পণ্ডিত, কেহ বা মূর্খ; কিন্তু এখন মনে হয় যে, অনন্যসাধারণ একটা কিছু সকলেরই মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল; ইস্কুলের মাষ্টার মহাশয়দের কাছে যেসব ছেলে পড়া মুখস্থ করিতে না পারিয়া লক্ষ্মীছাড়া বলিয়া গণ্য, অনেক সময় দেখিয়াছি তাহারা মানুষ হিসাবে "ভাল ছেলেদের" চেয়ে ঢের বেশী ভাল। ইংরাজীতে যাহাকে Adventurous বলে, আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনে সেরকম ছেলের স্থান নাই! ঘ্যান ঘ্যান করিয়া পড়া মুখস্থ করা তাহাদের পোষায় না; কাজে কাজেই তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্যজ্যপুত্র। কিন্তু যেখানে জীবন মরণ লইয়া খেলা, যেখানে আমাদের ভাবী ডেপুটী-মার্কা ছেলেরা এক পা আগাইয়া গিয়া দশ পা পিছাইয়া আসে, সেখানে ঐ "দস্যি" "বয়াটে" "লক্ষ্মীছাড়া" ছেলেগুলোই হাসিতে হাসিতে কাজ হাসিল করে।

বাগানের কাজকর্ম্ম যখন আরম্ভ হইয়া গেল, তখন ছেলেদের বারীনের কাছে রাখিয়া দেবব্রত ও আমি আর একবার আশ্রমের উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে বাহির হইলাম। দেবব্রতের তখন বাগানের কাজকর্ম্মের

সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কিছু ছিল না; কিন্তু তাহার মনটা তীর্থস্থানের সাধু দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া প'ড়য়াছিল; কাজকর্ম্ম তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না।

প্রথমেই গিয়া এলাহাবাদে একটা প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালায় দুই চারিদিন পড়িয়া রহিলাম। বাজারের পুরি কিনিয়া খাই, আর লম্বা হইয়া প'ড়য়া থাকি। মাঝে মাঝে এক একবার উঠিয়া এ সাধু ও সাধুর কাছে ঢু মারিয়া বেড়াই। মাঝে একজন স্থানীয় বন্ধু জুটিয়া আমাদের 'কুসি' দেখাইতে লইয়া গেলেন। সেখানে দেখিলাম—গঙ্গার ধারে শিয়ালের মত গর্ত্ত খুঁড়িয়া দুই চারিজন সাধু সেই গর্ত্তের মধ্যে বাস করিতেছেন। এক জায়গায় দেখিলাম, একটা সিন্দূর মাখান রামমূর্ত্তি; সম্মুখে ভক্তপ্রদত্ত চার পাঁচটি পয়সা, আর পাশেই একটা ছাইমাখা সাধু হাঁপানীতে ধুঁকিতেছে। শুনিলাম—মাটির নীচে সাধুদের সাধন-ভজনের জন্য অনেকগুলি ঘর আছে; কিন্তু আমাদের বন্ধুটীর নিকট সাধনের যে রকম বীভৎস বর্ণনা শুনিলাম, তাহাতে দেবব্রতেরও সাধুদর্শনের আগ্রহ অনেকটা কমিয়া গেল।

প্রয়াগ হইতে বিন্ধ্যাচলে আসিয়া এক ধর্ম্মশালায় কিছুদিন পড়িয়া রহিলাম। মাঠের মাঝখানে একখানি ছোট কুঁড়েঘর বাঁধিয়া একজন জটাজুটধারী সাধু সেখানে থাকেন। প্রণাম করিয়া তাহার কাছে বসিবামাত্র তাহার মুখ হইতে অনর্গল তত্ত্বকথা ও থুথু সমান বেগে ছুটিতে লাগিল। বাবাজী আহারাদির কোনও চেষ্টা করেন না; তবে তাঁহার কাছে ভক্তেরা যা প্রণামী দিয়া যায়, তাঁহার একজন গোয়ালা ভক্ত তাহা কুড়াইয়া লইয়া গিয়া তাহার পরিবর্ত্তে সাধুকে দুধসাগু তৈয়ার করিয়া দেয়। ঐ দুধসাগু খাইয়াই তিনি জীবনধারণ করেন। থুথু ও তত্ত্বকথা সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিয়া দেখি, এক গেরুয়া পরিহিতা

ত্রিশূলধারিণী ভৈরবী আমাদের কম্বল দখল করিয়া বসিয়া আছেন। দেবব্রত ব্রহ্মচারী মানুষ, স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে বসে না; সে ত ভৈরবীকে দেখিয়া প্রমাদ গণিল। এই সন্ধ্যার সময় তাহার পর্ব্বত-প্রমাণ বিপুল দেহভার লইয়া বেচারা কম্বল ছাড়িয়া যায়ই বা কোথায়? ভৈরবীর আপাদ-মস্তক দেখিয়া দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?"

ভৈরবী—"আমি সাধুসঙ্গ করতে চাই।"

দেবব্রত—"সাধুসঙ্গ করতে চান ত আমাদের কাছে কেন? দেখছেন না আমরা বাবুলোক; আমাদের পরণে ধুতি, চোখে সোনার চশমা?"

ভৈরবী—"তা হোক, আমি জানি—আপনারা ছদ্মবেশী সাধু।"

আমরা অনেক করিয়া বুঝাইলাম যে আমরা ছদ্মবেশীও নই, সাধুও নই, কিন্তু ভৈরবী ঠাকরুণ সেখান হইতে নড়িবার কোনই লক্ষণ দেখাইলেন না। শেষে অনেকক্ষণ তর্কবিতর্কের পর দেবব্রতই রণে ভঙ্গ দিয়া সে রাত্রি এক গাছতলায় পড়িয়া কাটাইয়া দিল।

কিন্তু ভৈরবী হইলে কি হয়, বাঙ্গালীর মেয়েত বটে! সকাল বেলা ঘুরিয়া আসিয়া দেখি, কোথা হইতে চাল ডাল জোগাড় করিয়া ভৈরবী রান্না চড়াইয়া দিয়াছেন। বেলা দশটা না বাজিতে বাজিতে আমাদের জন্য খিচুড়ী প্রস্তুত। কামিনী-কাঞ্চনে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে কিন্তু কামিনীর রান্না খিচুড়ী সম্বন্ধে শাস্ত্রের ত কোন নিষেধ নাই; সুতরাং আমরা নির্ব্বিবাদে সেই গরম গরম খিচুড়ী গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলাম। আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে তবে ভৈরবী আহার করিতে বসিলেন। দেখিলাম, বাঙালীর মেয়ের স্নেহক্ষুধাতুর প্রাণটুকু গৈরিকের ভিতর দিয়াও ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

বিন্ধ্যাচল হইতে চিত্রকূটে আসিলাম। ষ্টেশনে নামিতে না নামিতে ছোট বড় মাঝারি অনেক রকমের পাণ্ডা আমাদের উপর আক্রমণ

করিল। আমরা যে তীর্থ দর্শন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে চিত্রকূটে আসি নাই, একথা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে অনেকক্ষণ বক্তৃতা দিয়া তাহাদের বুঝাইলাম। কিন্তু তাহারা ছিনেজোঁকের মত আমাদের পিছনে লাগিয়াই রহিল। তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় আমরা পাণ্ডাদের আস্তানা ছাড়িয়া নদীর ধারে একটা পোড়ো ঠাকুরবাড়ীতে আসিয়া আড্ডা গাড়িলাম। কিন্তু পাণ্ডাদের অদ্ভুত অধ্যবসায়। পাঁচ সাত জন আমাদের ঘিরিয়া বসিয়া রহিল। তীর্থে আসিয়া ঠাকুর দর্শন করে না—এ আবার কেমন তীর্থযাত্রী? তিন চার ঘণ্টা বসিয়া থাকিবার পর গালি দিতে দিতে একে একে সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল —কেবল একটী ১০।১২ বছরের ছোট ছেলে নাছোড়বান্দা। সে তখনও বক্তৃতা চালাইতে লাগিল। একখানি হাত আপনার পেটের উপর রাখিয়া আর একখানি হাত দেবব্রতের মুখের কাছে ঘুরাইয়া বলিল— "দেখ বাবু—যে জীবাত্মা সেই পরমাত্মা। আমাকে খাওয়ালেই পরমাত্মার সেবা করা হবে।" পেটের জ্বালার সঙ্গে পরমার্থের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা শুনিয়া দেবব্রত হাসিয়া ফেলিল। বলিল—"দেখ, তোর কথাটার দাম লাখ টাকা। তবে আমার কাছে এখন অত টাকা নেই. বলে তোকে এযাত্রা একটা পয়সা নিয়েই বিদায় হতে হবে।" জীবরূপী পরমাত্মা তাহাই লইয়া প্রস্থান করিল।

যে ঠাকুরবাড়ীতে আমরা পড়িয়া রহিলাম, তাহার চারিদিকে গাছে গাছে বানর ছাড়া আর কোন জীবের দেখা সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত না। সেখান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে রেওয়ার রাজা বৈষ্ণব সাধুদের জন্য একটা মঠ তৈয়ারি করিয়া দিয়াছেন। সেখানে "আচারী" ও "বৈরাগী" প্রধানতঃ এই দুই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব সাধুরা থাকেন। তাহাদের দুই একজনের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হইত।

একদিন সকাল বেলা বসিয়া আছি এমন সময় সেখানে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। তিনি যুবা পুরুষ; বয়স আন্দাজ ৩২।৩৩; পরিচয়ে জানিলাম, তাঁহার জন্মস্থান গুজরাত; তাঁহার গুরুর আদেশ অনুযায়ী এই অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ান। আমাদের যে রাজনীতির সহিত কোনোও সম্পর্ক আছে তাহা তিনি কি করিয়া টের পাইলেন, ভগবানই জানেন। দুই একটা কথার পরই তিনি আমাদের বলিলেন—"দেখ, তোমরা যে মনে কর, এ অঞ্চলের লোক দেশের অবস্থা বুঝে না—সেটা মিথ্যা। সময় আসিলে দেখিবে ইহারাও ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হইয়া আছে।" আমরা কথাটা চুপ করিয়া শুনিলাম—দেখি শ্রাদ্ধ কোন্ দিকে গড়ায়। তিনি বলিতে লাগিলেন—"দেখ, তোমাদের একটা কথা বলিয়া রাখি। বিশ্বাস কর ত কথাটা খুবই বড়, আর না করত বাজে কথা বলিয়া ফেলিয়া দিও। জগতে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য ভগবান আবার অবতীর্ণ হইয়াছেন; তবে এখনও প্রকট হন নাই। তাঁহাকে নরদেহে টানিয়া আনিবার জন্যই যোগীদের সাধনা। সে সাধনা এবার সিদ্ধ হইবে। ভারতের দুঃখ তখনই ঘুচিবে।"

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি এসংবাদ জানিলেন কিরূপে?"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"আমি সন্ন্যাস লইবার পূর্ব্বে হনুমানজীর সাধন করিতাম। অনেক সাধন করিয়া কোন ফল না পাওয়ায় একবার নিরাশ হইয়া দেহত্যাগ করিতে চাই। সেই সময় হনুমানজী আমার নিকট প্রকাশিত হইয়া এই আশার সংবাদ আমাকে দিয়া যান।" ব্যাপারটা সন্ন্যাসীর মাথার খেয়াল, কি ইহার মূলে কোন সত্য নিহিত আছে তাহা ভগবানই বলিতে পারেন।

সন্ন্যাসীর নিকট হইতে আমরা বিদায় লইয়া একবার অমরকণ্টক যাইব স্থির করিলাম। বিন্ধ্য পর্ব্বতের যেখান হইতে নর্ম্মদার উৎপত্তি

অমরকণ্টক সেইখানে। কোন্ ষ্টেশনে নামিয়া কোথা কোথা দিয়া যে সেখানে গিয়াছিলাম এই দীর্ঘকাল পরে তার সবই ভুলিয়া গিয়াছি। শুধু মনে আছে যে, রাস্তায় একজন আগামী ভদ্রলোকের বাড়ী অতিথি হইয়া দিন দুই বেশ চব্যচোষ্য আহার করিয়াছিলাম। বহুদূর হাঁটিয়া ত' বিন্ধ্য পর্ব্বতের কাছে উপস্থিত হইলাম। পর্ব্বতটা কিন্তু আমাদের ভাল লাগিল না! কেমন নেড়া-নেড়া মনে হইতে লাগিল। শৃঙ্গসম্বলিত হিমালয়ের বেশ একটা প্রাণকাড়া সৌন্দর্য্য আছে, বিন্ধ্যাচলের তাহার নামগন্ধ নাই। তিন চার দিন চড়াই-উৎরাই-এর পর যখন অমরকণ্টকে পৌঁছিলাম, তখন দেখিলাম উহা আশ্রমের উপযুক্ত স্থান একেবারেই নয়। চারিদিকে শুধু বন-জঙ্গল, আর মাঝখানে একটা ভাঙ্গা ধর্ম্ম-শালায় জনকয়েক রামায়ৎ সাধু বসিয়া গাঁজা খাইতেছে। যেখানে পাহাড় হইতে বুদ্ বুদ্ করিয়া নর্ম্মদার ধারা বাহির হইতেছে সেখানে নর্ম্মদা-দেবীর একটী ছোট মন্দির আছে; তাহাও সংস্কারাভাবে নিতান্তই জীর্ণ। অমরকণ্টক এককালে যে বৌদ্ধদিগের তীর্থ ছিল তাহার নিদর্শন এখনও সেখানে বর্ত্তমান। ব্রহ্মদেশীয় পাগোদার মত অনেকগুলি পুরাতন কাঠের মন্দির সেখানে রহিয়াছে। কোন কোনটার মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি এখনও প্রতিষ্ঠিত, কোথাও বা অন্য সম্প্রদায়ের সাধুরা বুদ্ধমূর্ত্তি সরাইয়া দিয়া রাম বা কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। চারিদিকে শালবন,—সেখানে বাঘের দৌরাত্ম্যও যথেষ্ট। আশপাশের গ্রাম হইতে গরু ছাগল প্রায়ই বাঘে লইয়া যায়। যখন দুই চারজন মানুষকে লইয়া বাঘে টানাটানি করে তখন রেওয়া রাজ্যের সিপাহীরা একশ বৎসর আগেকার মুঙ্গেরী বন্দুক লইয়া গোটা দুই ফাঁকা আওয়াজ করিয়া কর্ত্তব্য পালন করে। সাধারণ লোকেদেরও বাঘের হাতে মরা সহিয়া গিয়াছে। জঙ্গলে ঢুকিবার আগে তাহারা বাঘের দেবতার পূজা দেয়, তাহার পরেও যদি

বাঘে ধরে ত সেটাকে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের উপর বরাত দিয়া নিশ্চিন্ত হয়। সাধুদেরও সেই অবস্থা; তবে তাঁহারা নর্ম্মদা পরিক্রম করিতে বাহির হইবার সময় প্রায়ই দল বাঁধিয়া বাহির হন। এই নর্ম্মদা-পরিক্রম আমার বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হইল। অমরকণ্টক হইতে আরম্ভ করিয়া পদব্রজে নর্ম্মদার ধারে ধারে গুজরাত পর্য্যন্ত যাইতে ও গুজরাত হইতে পুনরায় নর্ম্মদার অপর পার ধরিয়া অমরকণ্টকে ফিরিয়া আসিতে চার পাঁচ বৎসর লাগে। কত সাধুই যে এই কাজ করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন কোন স্ত্রীলোককে গণ্ডি কাটিতে কাটিতে নর্ম্মদা পরিক্রম করিতে দেখিয়াছি। ফল কি হয় জানি না। তবে এইটুকু মনে বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে, তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার শতাংশের একাংশ পাইলে আমরা মানুষ হইয়া যাইতাম!

অমরকণ্টকের চারিধারে দশ বারো ক্রোশ পর্য্যন্ত বনে জঙ্গলে ঘুরিলাম। পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে চণ্ডাল-পল্লীর যে রকম বিবরণ পাওয়া যায় সেরূপ কতকগুলি পল্লীও দেখিলাম। সেখানকার পালিত কুকুরগুলি প্রায় একক্রোশ আমাদের তাড়া করিয়া আসিয়াছিল। নদীর ধার ধরিয়া ছুটিতে ছুটিতে এক জায়গায় বাঘের পায়ের ছাপ ও সদ্য নিঃসৃত রক্তচিহ্নও দেখিলাম। ভবিষ্যতে আন্দামানে যাইতে হইবে সে কথা যদি তখন জানিতাম, তাহা হইলে ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা না করিয়া বাঘের আশায় সেইখানেই বসিয়া থাকিতাম! কিন্তু সে যাত্রা বাঘও দেখা দিল না আর ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাদের আশ্রমের উপযোগী স্থানও কোথাও মিলিল না। পাহাড় হইতে অগত্যা নামিতে হইল। নামিয়াই দেখিলাম—বারীনের চিঠি বলিতেছে "শীঘ্র ফিরিয়া এস"!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বারীনের চিঠি পাইয়াই তল্পি-তল্পা গুছাইয়া রওনা হইলাম। তল্পির মধ্যে লোটা কম্বল আর তল্পার মধ্যে একগাছা মোটা লাঠি। সুতরাং বেশী দেরি হইবার কোনও কারণ ছিল না! বাগানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম একেবারে "সাজ সাজ" রব পড়িয়া গিয়াছে। যে সমস্ত নূতন ছেলে আসিয়া জুটিয়াছে, উল্লাসকর তাহাদের মধ্যে একজন। প্রেসিডেন্সী কলেজের রসেল সাহেব বাঙ্গালীর ছেলেদের গালি দিয়াছিল বলিয়া উল্লাসকর একপাটী ছেঁড়া চটীজুতা বগলে পুরিয়া কলেজে লইয়া যায় এবং রসেল সাহেবের পিঠে তাহা সজোরে বখ্‌শিস দিয়া কলেজের মুখদর্শন বন্ধ করিয়া দেয়। তাহার পর কিছুদিন বোম্বাই-এর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ঘুরিয়া আসিয়া দেশ গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাগানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সে সময় কিংসফোর্ড সাহেব একে একে সব স্বদেশী কাগজওয়ালাদের জেলে পুরিতেছেন। পুলিসের হাতে এক তরফা মার খাইয়া দেশসুদ্ধ লোক হাঁফাইয়া উঠিয়াছে। যাহার কাছে যাও, সেই বলে—"নাঃ এ আর চলে না। ক' বেটার মাথা উড়িয়ে দিতেই হবে।" তথাস্তু। পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যখন সাহেবদের মধ্যে ছোটলাট আণ্ড্রু ফ্রেজারের মাথাটাই সব চেয়ে বড়, তখন তাঁহারই মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা আগে করা দরকার। কিন্তু লাট-সাহেবের মাথার নাগাল পাওয়া ত সোজা কথা নয়! ডিনামাইট কার্টিজ লাটসাহেবের গাড়ীর তলায় রাখিয়া দিলে কাজ চলিতে পারে কি না তাহা পরীক্ষার জন্য চন্দননগর ষ্টেশনের কাছাকাছি রেলের উপর গোটা কয়েক

ডিনামাইট কার্টিজ রাখিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু উড়া ত দূরের কথা—ট্রেণখানা একটু হেলিলও না। শুধু কার্টিজ ফাটার গোটা দুই ফট্ ফট্ আওয়াজ শূন্যে মিলিয়া গেল, লাট-সাহেবের একটু ঘুমের ব্যাঘাত পর্য্যন্ত হইল না। দিন কতক পরে শোনা গেল যে, লাট-সাহেব রাঁচি না কোথা হইতে কলিকাতায় স্পেসাল ট্রেণে ফিরিতেছেন। মেদিনীপুরে গিয়া নারায়ণগড় ষ্টেশনের কাছে ঘাঁটী আগলান হইল। বোমা বিস্থায় যিনি পণ্ডিত তিনি পরামর্শ দিলেন যে, রেলের জোড়ের মুখের নীচে মাটির মধ্যে যেন বোমাটা পুঁতিয়া রাখা হয়। তাহার পর সময়মত তাহাতে "স্লো ফিউজ" লাগাইয়া আগুন ধরাইয়া দিলেই কার্য্যোদ্ধার হইবে। কিন্তু লাট-সাহেবের এমনি অদৃষ্টের জোর যে, বোমা পুঁতিবার দিন আমাদের ওস্তাদজী পড়িলেন জ্বরে, আর যাঁহারা কেল্লা ফতে করিতে ছুটিলেন তাঁহারা একেবারে "ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস"। কাজেই বোমা ফাটিল, রেলও বাঁকিল, কিন্তু গাড়ী উড়িল না! তবে ইঞ্জিনখানা নাকি জখম হইল ; এবং খড়গপুর ষ্টেশন হইতে আর একটা ইঞ্জিন লইয়া গিয়া লাট-সাহেবের স্পেসালকে টানিয়া আনিতে হইল।

এই গাড়ী-ভাঙ্গা পর্ব্ব সাঙ্গ হইবার পর চারিদিকে গুজব রটিয়া গেল যে রুশিয়া হইতে নাকি এদেশে নিহিলিষ্টের আমদানী হইয়াছে। একদিন আমার আত্মীয় একজন বৃদ্ধ সরকারী কর্ম্মচারীর মুখে শুনিলাম যে তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, ইউরোপ হইতে এদেশে নিহিলিষ্টরা আসিয়াছে। ঐ নিহিলিষ্ট দলের একজন যে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া নিতান্ত ভাল মানুষটির মত চা খাইতেছে একথা জানিতে পারিলে বৃদ্ধ কি করিতেন কে জানে? যাই হোক, পুলিসের কর্ত্তারা গাড়ী ভাঙ্গার আসামী ধরিবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিলেন। সুতরাং আসামীর অভাব হইল না। জনকতক রেলের কুলীকে ধরিয়া

চালান করা হইল ; তাহারা না কি পুলিশের কাছে আপনাদের অপরাধও স্বীকার করিল। জজ-সাহেবের বিচারে তাহাদের কাহারও পাঁচ, কাহারও বা দশ বৎসর দ্বীপান্তরের হুকুম হইল ! পুলিসের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া যখন লোককে বিনা বিচারে অন্তরীণে রাখা হয় ; আর লাট-সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া সরকারী পেয়াদা পর্য্যন্ত পুলিসকে নির্ভুল প্রতিপন্ন করিবার জন্য একেবারে পঞ্চমুখে বক্তৃতা জুড়িয়া দেন তখন ঐ নারায়ণগড়ের ব্যাপার মনে করিয়া আমাদের হাসিও পায়, কান্নাও আসে।

এই সময় পুলিসের ঘোরাঘুরি একটু বাড়িয়াছে দেখিয়া আমাদের মনে হইল যে, কিছুদিনের জন্য বাগানে বেশী ছেলে রাখিয়া কাজ নাই। উল্লাস প্রভৃতি আমরা চার পাঁচ জন দেশটা একটু ঘুরিয়া দেখিবার জন্য বাগান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। কলিকাতা হইতে গয়া দিয়া বাঁকীপুর পৌঁছিবার পর একদল উদাসী সম্প্রদায়ের পাঞ্জাবী সাধুর সহিত মিশিবার সুবিধা হইয়া গেল।

গুরু নানকের প্রথম পুত্র শ্রীচাঁদ এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ইহাদের মাথায় লম্বা লম্বা জটা ; গায়ে ছাই মাখা ; কোমরে একটু কম্বলের টুকরা পিতলের শিকল দিয়া আঁটা। গাঁজার কলিকা অষ্ট প্রহর সকলকার হাতে হাতেই ঘুরিতেছে। যাঁহারা ইহাদের দলপতি, দেখিলাম একশো আট ছিলিম গাঁজা না খাইলে তাঁহাদের মুখ দিয়া কথাই বাহির হয় না। তামাকু সেবনও ইঁহারা করিয়া থাকেন, তবে তাহাও এমনি প্রচণ্ড যে তাহাতে একটান মারিলেই আমাদের মত পার্থিব জীবের মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতে হয়। গাঁজা ও তামাকের এই সদ্ব্যবহার দেখিয়াই বোধ হয় গুরুগোবিন্দ সিং শিখদের মধ্যে গাঁজা ও তামাক খাওয়া রহিত করিয়া দিয়া যান।

সাধুদের দলে একটী দশ বারো বৎসরের আর একটী পনেরো ষোল বৎসরের বাচ্ছা সাধু দেখিলাম। আমাদের দেশের সৌখিন ছেলেরা যেমন কামাইয়া গোঁফ তোলে, ইহারাও তেমনি চাঁচর কেশে আটা লাগাইয়া জটা বানায়। সংসারটা যে মরীচিকা, তা ইহারা এত অল্প বয়সে কি করিয়া আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, জানিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হইল। শেষে জানিলাম যে, ইহারা গরীবের ছেলে, সাধু হইলে পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে বলিয়া ইহাদের মা বাপ ইহাদের সাধুর দলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছে।

সাধুরা ভোর বেলা উঠিয়া স্নান করে; অর্থাৎ মাথা ছাড়া আর সর্ব্বাঙ্গ ধুইয়া ফেলে। দশ বারো দিন অন্তর জটা এলাইয়া এক এক বার মাথা ধুইবার পালা আসে। মেয়েদের খোঁপা বাঁধার চেয়ে ইহাদের জটাবাঁধা আরও জটিল ব্যাপার। পাকের পর পাক রাখিয়া চুলের গুছি দিয়া আঁটিয়া কেমন করিয়া সাজাইলে জটাগুলি বেশ চূড়ার মত মানানসই দেখায়, তাহা ঠিক করা একটা দস্তুর মত ললিত শিল্পকলা। সকালবেলা স্নানের পর ধুনি জ্বালিয়া সকলে গায়ে ছাই মাখিতে লাগিয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে স্তোত্র পাঠও চলে। বেলা আটটা নয়টার সময় 'কড়া-প্রসাদের' বন্দোবস্ত। সত্যপীরের সিন্নি হইতে আরম্ভ করিয়া মা কালীর প্রসাদ পর্য্যন্ত এ বয়সে অনেক রকম প্রসাদই খাইয়াছি। কিন্তু এই কড়াপ্রসাদের তুলনা নাই। এটা আমাদের হালুয়ার পাঞ্জাবী সংস্করণ। অনিত্য সংসারে এই ভগবৎ প্রসাদই যে সার বস্তু তাহা খাইতে না খাইতেই বুঝিতে পারা যায়; এবং সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি-রসে ভিজিয়া মনটা উদাস হইয়া আসে। মধ্যাহ্নে তোফা মোটা মোটা নরম নরম ঘৃতসিক্ত পাঞ্জাবী রুটি ও ডাল—এবং রাত্রিকালেও তদ্বৎ। দেখিতে দেখিতে চেহারাটা বেশ একটু লালাভ হইয়া উঠিল, আর মাঝে মাঝে মনে হইতে

লাগিল যে, মাণিকতলার বাগানে পোড়া খিচুড়ীর মধ্যে আর ফিরিয়া গিয়া কাজ নাই। এই সাধুদের মধ্যেই জটাজুট রাখিয়া বৈরাগ্য-সাধনায় লাগিয়া যাই! কিন্তু কপাল যাহার মন্দ, তাহার এত সুখ সহিবে কেন?

নেপালে 'ধুনি সাহেব' নামে উদাসী সম্প্রদায়ের এক তীর্থস্থান আছে। সাধুরা সেইখানে তীর্থ দর্শন করিতে যাইতেছিলেন। আমরা স্থির করিলাম তাঁহাদের সহিত রওনা হইব। কিন্তু আমাদের শ্রীঅঙ্গে তখন এক একটা গেরুয়া আলখেল্লা আঁটা; এবং উদাসী সম্প্রদায়ের ঐ গেরুয়াটা সম্বন্ধে বিষম আপত্তি। গেরুয়া পরা সাধুদের উপর তাঁহাদের বেশ একটু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আছে। তাঁহারা নিজেদের ছাই-মাখা অবধূত-মার্গকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। সে কথাটা আমাদের জানা ছিল না; তাহা হইলে গেরুয়া না পরিয়া খানিকটা ছাই মাখিয়াই বসিয়া থাকিতাম। কিন্তু এখন উপায়? একজন প্রবীণ সাধু এই দুরূহ সমস্যার মীমাংসা করিয়া বলিলেন যে, আমরা যদি তাঁহাদের নিকট দীক্ষা লইয়া উদাসীদের সেবকরূপে গণ্য হই, তাহা হইলে গেরুয়ার সঙ্গে একটা রফা করা যাইতে পারে। আমরা ভক্তিগদগদকণ্ঠে তাহাই করিতে স্বীকৃত হইলাম। আমাদের দীক্ষা দিবার আয়োজন হইল। একজন সাধু একটা বড় বাটীতে একবাটি চিনি গুলিয়া লইয়া আসিলেন। যিনি মঠাধ্যক্ষ তিনি ঐ চিনি গোলায় আপনার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ডুবাইয়া আমাদের তাহা খাইতে দিলেন। আমরা চোঁ চোঁ করিয়া তাহা খাইয়া ফেলিবার পর বৃদ্ধ আমাদের "এক ওঙ্কার সৎনাম কর্ত্তাপুরুষ" প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ করাইয়া আমাদের পিঠে এক একটা চড় মারিয়া বলিয়া দিলেন যে, আজ হইতে আমরা উদাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। দীক্ষা কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়ায় আমাদের গেরুয়ার দোষ খণ্ডিত হইল। আমরাও ভক্তি, বিস্ময়

ও পুলক ভরে আমাদের নূতন গুরুজীর পদধূলি মাথায় লইয়া কড়া প্রসাদের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলাম।

তীর্থদর্শনে যাত্রা করিলাম আমরা পাঁচ সাতজন বাঙ্গালী, আর ঐ ত্রিশ পঁয়ত্রিশজন পাঞ্জাবী সাধু। কিন্তু রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে নামিবার পর যখন হাঁটাপথ আরম্ভ হইল, তখন বুঝিলাম ব্যাপারটা নিতান্ত সুবিধার নহে। কুশী নদীর ধারে ধারে গভীর জঙ্গল; আর তাহার মাঝ দিয়া পাঁচ ছয় দিন ধরিয়া প্রত্যহ পনেরো ষোল ক্রোশ করিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে আমার পায়ে ত গোদ নামিয়া গেল! কিন্তু সাধুদের ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই, কাতরোক্তি নাই। দিনের পর দিন তাহারা রোদ মাথায় করিয়া অবলীলাক্রমে চলিয়াছে।

"তরাই" অতিক্রম করিয়া ক্রমে নেপালে একটা ছোট শহরে আসিয়া পৌঁছিলাম। জায়গাটার নাম হনুমান নগর। অধিবাসী প্রায় সমস্তই হিন্দুস্থানী; অনেকগুলি মারোয়াড়ীর দোকানও আছে; কিন্তু রাজকর্ম্মচারীরা সমস্তই গুর্খা। শহরের রাস্তাঘাটগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; এবং বড় রাস্তার ধারে ধারে ফুট-পাথও আছে। নেপালকে ছেলেবেলা হইতে আমার একটু "জঙ্গলী" বলিয়া ধারণা ছিল; আজ সে ধারণা অনেকটা কাটিয়া গেল। স্বাধীন হিন্দুরাজার রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এই কথা ভাবিয়া মনটা যেন তোলপাড় করিতে লাগিল। ভক্তিভাবে নেপালের মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া হাঁ করিয়া খুব খানিকটা স্বাধীন দেশের হাওয়া খাইয়া লইলাম। দেশটা বাস্তবিকই বড় সুন্দর!

পাড়াগাঁয়ের পাশ দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম যে, চালাঘরগুলি আমাদের দেশের চালা ঘরের চেয়ে ঢের বেশী সুশ্রী। যে দিকে চাও, যেন সৌন্দর্য্যের ঢেউ খেলিতেছে, কোথাও একটু বিষাদ বা দৈন্যের ছায়ামাত্র নাই। গ্রামবাসীরা সাধুদের বিশেষ ভক্ত। একদিন চলিতে

চলিতে জ্বরাক্রান্ত হইয়া একটা গ্রামের ধারে মাঠের উপর পড়িয়াছিলাম। আমার সঙ্গীটি গ্রামের মধ্যে জল আনিতে গিয়া তাঁহার প্রকাণ্ড লোটা ভরিয়া দুধ লইয়া আসিলেন। তৃষ্ণার্ত্ত সাধুকে কি জল দেওয়া যায়! শুনিলাম নেপালে সাধুদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। ক্ষুধায় কাতর হইলে সাধুরা যে-কোন স্থান হইতে আহার্য্য উঠাইয়া লইতে পারেন। তাহার জন্য তাঁহারা রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হ'ন না।

'ধুনি সাহেবে' উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—চারিদিকে শুধু শাল বন আর শাল বন! একজন উদাসী সাধু—বাবা প্রীতম দাস—বহুকাল পূর্ব্বে এইখানে সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া তাঁহার ধুনি আজপর্য্যন্ত সেখানে জ্বলিতেছে; এবং সেই ধুনি হইতেই এইস্থানের নামকরণ হইয়াছে। অনেক রকম অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিলাম। বাবা প্রীতম দাসের দুই শিষ্য তাঁহার নিকট হইতে আম খাইতে চাহিলে তিনি সিদ্ধির বলে দুটী শাল গাছে আম ফলাইয়া দিয়াছিলেন; আর সেই অবধি সেই দুটী শাল গাছে নাকি এখনও দুই একটা আম ফলে! গল্পিকা সিদ্ধি কি সোজা কথা!

তিন দিন সেই সিদ্ধপুরীতে বাস করিয়া আবার নরলোকে ফিরিয়া আসিলাম। বাঁকীপুরে আমাদের দুই চারিজন বন্ধুবান্ধব জুটিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজগৃহে আমাদের থাকিবার জন্য মঠ বানাইয়া দিতে চাহিলেন কিন্তু বাংলাদেশের মাটি আমাদের নাড়ী ধরিয়া টানিতেছিল। আমরা রওনা হইয়া পড়িলাম। ফিরিবার পথে একখানা কাগজে পড়িলাম যে, ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন সাহেবকে কে গুলি করিয়াছে। বুঝিলাম এবার শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াইবে!

বাগানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম বারীন সেখানে নাই। সে কংগ্রেস উপলক্ষে সুরাত গিয়াছে। সুরাতে যে সেবার একটা লঙ্কাকাণ্ড

ঘটিবে তা' মেদিনীপুরের কন্‌ফারেন্সে গিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম! দুই একদিন পরে বারীন ফিরিয়া আসিল। সুরাতে নরম, গরম, অতি-গরম সব রকম নেতারাই একত্র হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বারীন যাহা সার-সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহা সে এক কথায় বলিয়া দিল—"চোর, বেটারা চোর।"

সমস্বরে আমরা সকলেই ধ্বনি করিয়া উঠিলাম—

"কেন? কেন? কেন?"

বারীন বলিল—"এতদিন স্যাঙ্গাতেরা পট্টি মেরে আসছিলেন যে, তাঁরা সবাই প্রস্তুত; শুধু বাংলাদেশের খাতিরে তাঁরা বসে আছেন। গিয়ে দেখি না সব ঢুঁ ঢুঁ। কোথাও কিছু নেই; শুধু কর্ত্তারা চেয়ারে বসে বসে মোড়লি কচ্ছেন। দু' একটা ছেলে একটু আধটু কাজ করবার চেষ্টা করছে, তা'ও কর্ত্তাদের লুকিয়ে। খুব কসে ব্যাটাদের শুনিয়ে দিয়ে এসেছি!"

এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম বর্গীরা একেবারে খাপ খুলিয়া বসিয়া আছেন; আর আজ এই সব ফক্কিরারের কথা শুনিয়া মনটা বেশ খানিকটা দমিয়া গেল। কিন্তু বারীন বলিল—

"কুছ্ পরোয়া নেই। ওরা যদি সঙ্গে এল তো এল; আর তা যদি না হয়—'ত একলা চলরে'। আমরা বাংলা দেশ থেকেই পাঁচ বছরের মধ্যে গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করে দেব। লেগে যাও সবে আজ থেকে ছেলে জোগাড় করতে।"

সুতরাং চারিদিক হইতেই একটা হৈ হৈ রৈ রৈ সাড়া পড়িয়া গেল। ক্রমাগতই নূতন নূতন ছেলে আসিয়া জুটিতে লাগিল; কিন্তু আমাদের পিছে যে পুলিস লাগিয়াছে, এ সন্দেহ করিবারও নানা কারণ ঘটিল। ছেলেদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিবার চেষ্টাও হইল, কিন্তু অতগুলা বাড়ী

ভাড়া করিবার পয়সা কোথায়? ছেলেদের খাইবার পয়সা জোটানই যে মুস্কিল! শেষে বৈদ্যনাথের কাছে মাঠের মাঝখানে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া সেই খানেই বোমার আড্ডা উঠাইয়া লইয়া যাওয়া স্থির হইল। বাগানটা প্রধানতঃ নূতন ছেলেদের পড়াশুনা করিবার আড্ডা হইয়া রহিল। বোমার আড্ডায় উল্লাসকর আড্ডাধারী হইয়া বসিল; আমি ষষ্ঠীবুড়ী হইয়া বাগানে ছেলেদের আগলাইতে লাগিলাম। বারীন চিরদিনই কর্ম্মী পুরুষ; তাহাকে এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিবার হুকুম বিধাতা দেন নাই। সে সমস্ত কর্ম্মের কেন্দ্রগুলি তদারক করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

এই সময় একটা দুর্ঘটনায় আমাদের মন বড় খারাপ হইয়া গেল। আমাদের একটী ছেলে বোমা ফাটিয়া মারা পড়ে। আমাদের যতগুলি ছেলে ছিল, তাহাদের মধ্যে সেইটীই বোধ হয় সব চেয়ে বুদ্ধিমান। তাহার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কি ছিল যে, যে তাহাকে দেখিয়াছে সেই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে নাই! তাহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মাথার মাঝখান হইতে কোমর পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া কি যেন একটা সড়াৎ করিয়া নামিয়া গেল। একটা অন্ধ রাগ আর ক্ষোভে মনটা ভরিয়া গেল। মনটা শুধু আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বলিতে লাগিল।—"সব চুলোয় যাক, সব চুলোয় যাক!"

বৈদ্যনাথে তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে মন টিকিল না। অন্ধকার পথ যে দিন দিন আরও অন্ধকারময় হইয়া উঠিতেছে তাহা বেশ বুঝিলাম।

কিন্তু উপায় নাই—চলিতেই হইবে। অনশন, অর্দ্ধাশন, আসন্ন বিপদ ও প্রিয়জনের ভীষণ মৃত্যুর মধ্য দিয়া এ দুর্গম পথ অতিক্রম করিতেই হইবে। এ বিবাহের যে এই মন্ত্র!

বাহিরে কাজকর্ম্ম তুমুল বেগে চলিতে লাগিল; কিন্তু মনের মধ্যে কেমন যেন একটা শক্তির অভাব অনুভব করিতে লাগিলাম। এই যে অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিয়া চলিয়াছি, ইহার শেষ কোথায়? এই যে এতগুলা ছেলেকে ক্রমশঃ মরণের মুখে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছি, মরণের ভয়টা কি আমাদের নিজেদের মন হইতে সত্যসত্যই মুছিয়া গিয়াছে? আর তা'ও যদি না হয়, ত দিনের পর দিন অন্ধের মত ছেলেগুলোকে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইব? পথ যে নিজেদের চোখেই ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া উঠিতেছে! বারীনের মনে এ সময় কি হইত ঠিক জানি না। কোন দুঃসাহসের কার্য্যে তাহাকে এ পর্য্যন্ত কখনও ভয়ে পিছাইয়া আসিতে দেখি নাই। তবে সেও যেন মাঝে মাঝে নিজের ভিতর ঢুকিয়া শক্তি সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত বলিয়া মনে হয়। একটা কিছুর উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে আমাদের কাঁধের বোঝাটা যেন একটু হালকা হইয়া যাইত। এই জন্যই বোধ হয় যে সাধুটীর নিকট গুজরাতে সে দীক্ষা লইয়াছিল, তাঁহাকে এই সময় একবার বাংলাদেশে আসিবার জন্য সে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখে।

১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সাধুটী মাণিকতলার বাগানে আসিয়া উপস্থিত হন। দুই চারিদিন আমাদের সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া তিনি বলিলেন—"তোমরা যে পন্থা ধরিয়াছ তাহা ঠিক নহে। অশুদ্ধ মন লইয়া এ কাজে লাগিলে খানিকটা অনর্থক খুনোখুনির সম্ভাবনা। এ অবস্থায় যাহারা দেশের নেতৃত্ব করিতে চায়, তাহাদের অন্ধের মত কাজ করা চলিবে না। ভবিষ্যতের পরদা যাঁহাদের চোখের কাছ থেকে কতকটা সরিয়া গিয়াছে, ভগবানের নিকট হইতে যাঁহারা প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন, তাঁহারাই এ কাজের যথার্থ অধিকারী। তোমাদের মধ্যে অন্ততঃ কয়েককে এই প্রত্যাদেশ পাইবার জন্য সাধনা করিতে হইবে।"

সাধনার ফরমাইস শুনিয়া ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। প্রত্যাদেশ না অশ্বডিম্ব! ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিব তাহার মধ্যে আবার ভগবানকে লইয়া এত টানাটানি কেন?

সাধু বলিলেন—“সকলের জন্য এ সাধনা নয়, শুধু নেতাদের জন্য। যাহারা দেশের লোককে পথ দেখাইবে, তাহাদের নিজেদের পথটা জানা চাই। দেশ স্বাধীন করিতে হইলেই যে খুব খানিকটা রক্তারক্তি দরকার,—এ কথাটা সত্য নাও হইতে পারে।”

বিনা রক্তপাতে যে দেশোদ্ধার হইবে এ কথাটা আমাদের নিতান্ত আরব্য উপন্যাসের মত মনে হইল! আমরা একটু বিজ্ঞভাবে হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“তাও কি সম্ভব?”

সাধু বলিলেন—“দেখ, বাবা, যে কথা আমি বলিতেছি, তাহা জানি বলিয়াই বলিতেছি। তোমরা যে উদ্দেশ্যে কাজ করিতেছ, তাহা সিদ্ধ হইবে, কিন্তু যে উপায়ে হইবে ভাবিতেছ, সে উপায়ে নয়। আমার বিশ বৎসরের সাধনার ফলে আমি ইহাই জানিয়াছি। চারিদিকের অবস্থা এক সময় এমনি হইয়া দাঁড়াইবে যে, সমস্ত রাজ্যভার তোমাদের হাতে আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে। তোমাদের শুধু শাসন-ব্যবস্থা প্রণালী গড়িয়া লইতে হইবে মাত্র। আমার সঙ্গে তোমরা জন কতক এস; সাধনার প্রত্যক্ষ ফল যদি কিছু না পাও, ফিরিয়া আসিও।”

সে-দিন সাধু চলিয়া যাইবার পর আমাদের মধ্যে বিষম তর্কাতর্কি বাধিয়া গেল। বারীন ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—“কিছুতেই নয়। কাজ আমি ছাড়বো না। বিনা রক্তপাতে ভারত উদ্ধার—এটা ওঁর খেয়াল। সাধুর আর সব কথা মানি, শুধু ঐটে ছাড়া।”

আমার মনটা কিন্তু সাধুর কথায় বেশ একটু ভিজিয়াছিল; দেখাই যাক না, রাস্তাটা যদি কোন রকমে একটু পরিষ্কার হয়!

নিজের সঙ্গে বেশ একটা বোঝাপড়া না হইলে কোন কাজেই যে মন যায় না!

আমি আর দুই একটী ছেলেকে লইয়া সাধুর সঙ্গে যাইব বলিয়া স্থির করিলাম। সাধু আর একদিন বারীনকে বুঝাইতে আসিলেন কিন্তু পরের উপদেশ লইবার সু-অভ্যাস বারীনের একেবারেই নাই। কোন রকমে বারীনকে বাগাইতে না পারিয়া শেষে সাধু বলিলেন— "দেখ, এ রাস্তা যদি না ছাড়, ত তোমাদের অল্পদিনের মধ্যে ভীষণ বিপদ অনিবার্য্য।"

বারীন দুই হাত নাড়িয়া বলিল - "না হয় ধ'রে ঝুলিয়ে দেবে—এই বৈ ত নয়! তার জন্য ত প্রস্তুত হয়েই আছি।"

সাধু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—"যা ঘট্‌বে, তা মৃত্যুর চেয়েও ভীষণ!"

সে-দিনের সভা ঐ খানেই ভঙ্গ হইল। সাধু ফিরিয়া যাইবার দিন স্থির করিলেন! কিন্তু সে-দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, আমার পা-ও যেন ততই বাগান ছাড়িয়া উঠিতে চাহিল না। স্ত্রী, পুত্র, ঘর, বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছি, সেটা তত কঠিন বলিয়া মনে হয় নাই; কিন্তু যাহারা আমাদের দেখিয়া মা বাপের স্নেহ, ভবিষ্যতের আশা, এমন কি প্রাণের মমতা পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়াছে, তাহাদের ছাড়িয়া আজ কোথায় পলাইব? অনেক আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রীতি, উৎসাহ এই বাগানের সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়াছে; আজ সেই গড়া জিনিস ছাড়িয়া কোন্ অজানা দেশে আপনার লক্ষ্য খুঁজিতে বাহির হইব? নির্দ্দিষ্ট দিনে সাধুর সহিত আর আমাদের যাওয়া হইল না। মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি তিনি একাই ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাধু চলিয়া যাইবার পর আবার ভাঙ্গা মন জোড়া দিয়া কাজ কর্ম্মে লাগিয়া গেলাম। আমরা তখন স্থির করিয়াছিলাম যে, দেশময় নিজেদের কেন্দ্র স্থাপন করিয়া দেশের শক্তি বেশ সংহত করিয়া তাহার পর বিপ্লবের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিব। কিন্তু দেশের লোকের মাথায় তখন খুন চাপিয়াছে। সুদূর আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নীরবে সমস্ত লজ্জা, অপমান, নির্য্যাতন সহ্য করা যে কত কঠোর সাধনা সাপেক্ষ তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ বুঝিবে না। দেশের সে শিক্ষা তখনও হয় নাই,—এখনও হইয়াছে কি?

অর্থ সংগ্রহ করা ক্রমে বিষম দায় হইয়া উঠিল। কাজ বাড়িতেছে; ছেলের সংখ্যাও বাড়িতেছে—কিন্তু টাকা কোথাও? এক আধ জন ধনবান কাপ্তেন না পাকড়াইলে ত আর কাজ চলে না! কিন্তু তাহাদের তুষ্ট করিতে গেলে এক আধটা বড় লাট বা ক্ষুদে লাটের ঘাড়ে বোমা ফেলিতে হয়!

যাতায়াতের ব্যয় সঙ্কোচ করিবার জন্য বোমার আড্ডা দেওঘর হইতে কলিকাতায় উঠাইয়া আনা হইল। সেখানে যাহাতে লোকের গতিবিধি কম হয় ও পুলিসের নজর না পড়ে সেই জন্য ভবানীপুরে আর একটী বাড়ীতে পুরাতন ছেলেদের রাখিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইল। বাগানে রহিল প্রধানতঃ নূতন ছেলেরা।

কিন্তু শত চেষ্টায়ও পুলিসের দৃষ্টি আমরা এড়াইতে পারিলাম না।

পুলিস যে আমাদের সন্দেহ করিয়াছে একথা মনে করিবার নানা কারণ ঘটিতে লাগিল। দেখিলাম বাগানের আশে-পাশে রকম বেরকমের অজানা লোক ঘুরিতেছে। রাস্তা চলিবার সময়ও দুই একজন পিছে পিছে চলিয়াছে! একদিন চলিতে চলিতে হঠাৎ পিছন ফিরিয়া দেখিলাম একজোড়া প্রকাণ্ড গোঁফের উপর হইতে দুইটা গোল গোল চোখ আমার দিকে প্যাট প্যাট করিয়া চাহিয়া আছে। যেদিকে যাই, চোখ দুইটা আমার পিছে পিছে ছুটিতে লাগিল। শেষে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গিয়া সেদিন কোনরূপে সে শনির দৃষ্টি হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম।

মাণিকতলার সব-ইন্‌স্পেক্টর বাবুও মাঝে মাঝে বাগানে আসিয়া আমাদের সহিত আলাপ করিয়া যাইতেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে বৃথাই সন্দেহ করিতাম। তিনি বাগানটাকে শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারীর আশ্রম বলিয়াই জানিতেন।

এই রকমে আরও একটা মাস কাটিল। শেষে মোজাফরপুরে বোমা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বাগানের পরমায়ু ফুরাইল!

সেদিনের কথা আমার চিরকালই মনে থাকিবে। একে বৈশাখ মাস, দারুণ রৌদ্র। তাহার উপর সমস্ত দিন টো টো করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন সন্ধ্যার পর বাগানে ফিরিয়া আসিলাম, তখন হাত পা এবং পেট সকলেই সমস্বরে আমাকে বাপান্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্বয়ং যমরাজ যদি তাঁহার মহিষটীর স্কন্ধে চড়িয়া আমাকে তখন তাড়া করিয়া আসিতেন তাহা হইলেও আমি এক পা নড়িয়া বসিতাম কিনা সন্দেহ। সকলেরই প্রায় ঐ এক দশা। কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা; দুটা রাঁধিয়া না খাইলে নয়। আমাদের ত আর রাঁধুনী বা চাকর ছিল না যে, ঘুরিয়া আসিয়া বাড়া ভাতের থালে বসিয়া যাইব। ভাত রাঁধা

কাপড় কাচা, ঘর ঝাট দেওয়া সবই আমাদের নিজের হাতে করিতে হইত। ছেলেরা তাড়াতাড়ি রাঁধিতে বসিয়া গেল, আর আমরা কল্পনার রথে চড়িয়া ভারত উদ্ধার করিতে বাহির হইলাম। কিন্তু সেদিন আমাদের উপর শনির এমন খরদৃষ্টি যে ভাত নামাইবার সময় হাঁড়ি ফাঁসিয়া সব ভাত মাটিতে পড়িয়া গেল। ছেলেরা হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি বুঝিলাম সে দিন মা লক্ষ্মী আর অদৃষ্টে অন্ন লেখেন নাই। পেটে তিনটা কিল মারিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু বারীন্দ্র চিরদিনই উদ্যোগী পুরুষ, দমিবার পাত্র নয়; সে সেই রাত দশটার সময় জ্বালানী কাঠের অভাবে খবরের কাগজ জ্বালাইয়া ভাত রাঁধিতে গেল। রাত এগারটার সময় ভাত খাইতে বসিতেছি, এমন সময় আমাদের এক বন্ধু কলিকাতা হইতে নাচিতে নাচিতে উপস্থিত। কি সংবাদ? তিনি ভাল লোকের কাছে খবর শুনিয়া আসিয়াছেন যে, বাগানে শীঘ্রই পুলিসের খানাতল্লাস হইবে; সুতরাং আমাদের বাগান ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া উচিত। তথাস্তু; কিন্তু এ রাতে ত ঠ্যাং ধরিয়া টানিয়া বাহির না করিলে কেহ বাগান ছাড়িতে রাজী হইবে না। সুতরাং স্থির হইল যে কাল সকালেই সকলে আপন আপন পথ দেখিবে। বারীন্দ্র কিন্তু কয়েকজন ছেলেকে লইয়া সেই রাত্রেই কোদাল ঘাড়ে করিয়া যে দুই চারিটা রাইফেল ও রিভলভার বাহিরে পড়িয়াছিল সেগুলাকে মাটীর তলায় পুঁতিয়া রাখিয়া আসিল। আমাদের শুইতে রাত বারোটা বাজিয়া গেল।

রাত্রি যখন প্রায় চারটা, তখনও কতকটা গ্রীষ্মের জ্বালায়, কতকটা মশার কামড়ে শুইয়া শুইয়া ছটফট্ করিতেছি। এমন সময় শুনিলাম যে কতকগুলা লোক মস্‌মস্ করিয়া সিঁড়িতে উঠিতেছে; আর তাহার

একটু পরেই দরজায় ঘা পড়িল—গুম্ গুম্ গুম্। বারীন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই একটা অপরিচিত ইউরোপীয় কণ্ঠে প্রশ্ন হইল ;—

"Your name ?"

.. "Barindra Kumar Ghose"

হুকুম হইল—"বাঁধো ইস্‌কো"

বুঝিলাম ভারত উদ্ধারের প্রথম পর্ব্ব এইখানেই সমাপ্ত। তবুও মানুষের যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। পুলিস প্রহরীরা ঘরে ঢুকিয়া যাহাকে পাইতেছে তাহাকেই ধরিতেছে, কিন্তু ঘর তখনও অন্ধকার ভাবিলাম—Now or never. আর এক দরজা দিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া দেখিলাম চারিদিকে আলো জ্বালিয়া পুলিশ প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। রান্নাঘরের একটা ভাঙ্গা জানালা দিয়া বাহিরে লাফাইয়া পড়া যায় ; সেখানে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম নীচে দুইজন পুলিস প্রহরী। হায়রে ! অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায় ! অগত্যা বারান্দার পাশে একটা ছোট ঘর ছিল, তাহারই মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। ঘরটী ভাঙ্গাচুরা কাঠ কাঠরায় পরিপূর্ণ ; আরসুলা ও ইন্দুর ভিন্ন অপর কেহ সেখানে বাস করিত না। চাহিয়া দেখিলাম একটা জানালার সম্মুখে একখানা জরাজীর্ণ চটের পরদা ঝুলিতেছে। তাহারই আড়ালে দাঁড়াইয়া দাড়াইয়া জানালার ফাঁক দিয়া পুলিস প্রহরীদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। সে রাতটুকু যেন আর কাটে না !

ক্রমে কাক ডাকিল ; কোকিলও এক আধটা বোধ হয় ডাকিয়াছিল। পূর্ব্বদিক একটু পরিষ্কার হইলে দেখিলাম বাগান লাল পাগড়ীতে ভরিয়া গিয়াছে। কতকগুলা গোরা সার্জ্জেণ্ট হাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাবুক লইয়া ঘুরিতেছে। পাড়ার যে কয়জন কোচম্যান জাতীয়

জীবকে খানাতল্লাসির সাক্ষী হইবার জন্য পুলিসের কর্ত্তারা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন তাহারা এক বিপুলকায় ইন্সপেক্টর সাহেবের পশ্চাৎ "হুজুর, হুজুর" করিতে করিতে ছুটিতেছে। পুকুর ঘাটের একটা প্রকাণ্ড আমগাছের তলায় আমাদের হাতবাধা ছেলেগুলা জোড়া জোড়া বসিয়া আছে; আর উল্লাসকর তাহাদের মধ্যে বসিয়া ইন্সপেক্টর সাহেবের ওজন তিন মণ কি সাড়ে তিন মণ এই সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ বিচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

ক্রমে ছয়টা বাজিল, সাতটা বাজিল; আমি তখনও পর্দ্দানসিন বিবিটির মত পর্দ্দার আড়ালে। ভাবিলাম এ যাত্রা বুঝি কর্ত্তারা আমাকে ভুলিয়া যায়! কিন্তু সে বৃথা আশা বড় অধিক ক্ষণ পোষণ করিতে হইল না। আমাদের অতিকায় ইন্সপেক্টর সাহেব জুতার শব্দে পাশের ঘর কাঁপাইতে কাঁপাইতে আসিয়া আমার ঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিলেন। পাছে নিশ্বাসের শব্দ হয় সেই ভয়ে আমি নাক টিপিয়া ধরিলাম। কিন্তু বলিহারী পুলিসের ঘ্রাণশক্তি! সাহেব সোজা আসিয়া আমার লজ্জানিবারিণী পর্দ্দাখানি একটানে সরাইয়া দিলেন। তারপরেই চারিচক্ষের মিলন—কি স্নিগ্ধ! কি মধুর! কি প্রেমময়! সাহেব ত দিগ্বিজয়ী বীরের মত উল্লাসে এক বিরাট "Hurrah" ধ্বনি করিয়া ফেলিলেন। সেই ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চার পাঁচজন পার্ষদ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কেহ ধরিল আমার পা, কেহ ধরিল হাত, কেহ ধরিল মাথা। তাহার পর কাঁধে তুলিয়া হুলুধ্বনি করিতে করিতে আমাকে একেবারে হাতবাঁধা ছেলের দলের মাঝখানে বসাইয়া দিল। আমার হাত বাঁধিবার হুকুম হইল। যে পুলিস প্রহরী আমার হাত বাঁধিতে আসিল—হরি! হরি!—সে যে আমাদের 'বন্দেমাতরম্' আফিসের ভূতপূর্ব্ব বেহারা! কতকাল সে আমাকে বাবু বলিয়া সেলাম

করিয়া চা খাওয়াইয়াছে। আজ আমার হাত বাঁধিতে আসিয়া সে বেচারীও লজ্জায় মুখ ফিরাইল।

এদিকে থানাতল্লাসী করিতে করিতে গত রাত্রের পোঁতা রাইফেল ও বোমাগুলি বাহির হইয়া পড়িল। আর কোনও জিনিস কোথাও পোঁতা আছে কি না জানিবার জন্য পুলিস ছেলেদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিতেছে দেখিয়া বারীন্দ্র ইন্সপেক্টর জেনারেল প্লাউডেন সাহেবের নিকট নালিস করে। সাহেব হাসিয়া সে কথা উড়াইয়া দেন। বলেন—"You must not expect too much from us" "আমাদের নিকট হইতে বড় বেশী কিছু আশা করিও না।"

সেদিন ভিন্ন ভিন্ন থানায় লইয়া গিয়া আমাদিগকে আবদ্ধ রাখা হইল। অদৃষ্টে তিনখানা পুরী ভিন্ন আর কিছু জুটিল না। পরদিন প্রাতঃকালে সি-আই-ডি পুলিস আফিসে গিয়া শুনিলাম যে, বাগান ভিন্ন আরও দুই তিন স্থানে তল্লাসী করা হইয়াছে এবং আমাদের সহিত সংশ্রব ছিল না এরূপ অনেক লোকও ধৃত হইয়াছেন। ডেপুটী সুপারিন্টেনডেন্ট রামসদয় বাবু আমাদিগকে দিদিশাশুড়ীর মত আদর যত্ন করিয়া তুলিয়া লইলেন। তাঁহার হাতে বাধা একটা প্রকাণ্ড ঢোলকের মত মাদুলী বাহির করিয়া বলিলেন যে, তিনি খ্যাতনামা সাধক কমলাকান্তের বংশধর; আর ঐ মাদুলীর মধ্যে কমলাকান্তের সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন পদধূলি বিদ্যমান। আমাদের মাথায় সেই মাদুলীটি ঠেকাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কখনও হাসিয়া কখনও বা কাঁদিয়া কমলাকান্তের বংশধরটী আমাদের বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার মত সুহৃদ আমাদের আর ত্রিভুবনে নাই। তিনি নাকি আমাদের কাজকর্ম্মের সহিত গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন! তবে কি করেন পেটের দায়—ইত্যাদি। বাগবাজারের আর একজন ইন্সপেক্টর বাবু অশ্রুনীরে গণ্ড প্লাবিত

করিয়া আধ আধ স্বরে আমাদের জানাইয়া দিলেন যে, আমাদের ধরিয়া তিনি যে কসাইবৃত্তি করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত! বলা বাহুল্য আমাদের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি (Confession) বাহির করাই এ সমস্ত অভিনয়ের উদ্দেশ্য। আইন কানুন সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা যেরূপ প্রচণ্ড তাহাতে আমাদিগকে বধ করিতে তাঁহাদের বড় অধিক বেগ পাইতে হইল না। উল্লাস বলিল যে, যে সমস্ত বাহিরের লোক বিনা কারণে আমাদের সঙ্গে ধরা পড়িয়াছে তাহাদের বাঁচাইবার জন্য আমাদের সব সত্য কথা বলা দরকার। উল্লাসের ধারণা আমরা সত্যকথা বলিলেই ধর্ম্মাত্মা পুলিস কর্ম্মচারীরা তাহা বিশ্বাস করিয়া বেচারাদের ছাড়িয়া দিবে। বারীন্দ্র বলিল—"আমাদের দফা ত এইখানেই রফা হইল, এখন আমরা যে কি করিতে-ছিলাম তাহা দেশের লোককে বলিয়া যাওয়া দরকার।" এই সমস্ত কথা লইয়া বিচার বিতর্ক চলিতেছে এমন সময় রায় বাহাদুর রামসদয় একখণ্ড হাতেলেখা কাগজ লইয়া ঘরে ঢুকিলেন। মহা উৎসাহে বলিলেন—"এই দেখ, বাবা, হেমচন্দ্রের statement; সে সব কথাই স্বীকার করেছে।" বলা বাহুল্য, কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা; হেমচন্দ্রের বলিয়া যে Statementটা তিনি আমাদের শুনাইলেন তাহা একেবারেই তাঁহার মনগড়া। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির অবস্থা তখন এমনই শোচনীয় যে, সমস্ত ব্যাপারটা যে আমাদের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি বাহির করিবার জন্য অভিনয়মাত্র তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমরা দুই একটা ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া সে রাত্রের জন্য নিষ্কৃতি পাইলাম।

পর দিন দুপুর বেলা যখন আমাদের লালবাজার পুলিস কোর্টে হাজির করা হইল তখন ধর-পাকড়ের উত্তেজনা অনেকটা কমিয়া

গিয়াছে; ছেলেদের মধ্যে অনেকেরই মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। একটী ছেলে কাছে আসিয়া বলিল—"দাদা, পেটের জ্বালাতেই মরে গেলুম! কাল সমস্ত দিন পেটে ভাত পড়েনি। দুপুর বেলা শুধু দুটো মুড়ি খেতে দিয়েছিল।" বারীন্দ্র লাফাইয়া উঠিল। কাছেই ইন্সপেক্টর বিনোদ গুপ্ত দাঁড়াইয়া ছিলেন; তাঁহাকে বলিল—"বাপু আমাদের ফাঁসি মাসি যা কিছু দিতে হয় দাও; ছেলেগুলোকে এমন ক'রে দগ্ধাচ্ছ কেন?" বিনোদ গুপ্ত তাড়াতাড়ি—"এই, ইয়া ল্যাও, ইয়া ল্যাও" করিয়া একটী সবইন্সপেক্টর বাবুর উপর খাবার আনিবার জন্য হুকুম চালাইলেন; সবইন্সপেক্টর বাবুটী হেড কন্সটেবল ও হেড কন্সটেবলটী একজন অভাগা কন্সটেবলের উপর হুকুম জাহির করিয়া সরিয়া পড়িলেন। ফলে পুনঃ পুনঃ তাগাদায় এক গ্লাস জল ভিন্ন আর কিছু আসিয়া পৌছিল না। বিনোদ গুপ্তকে সে কথা জানাইলে তিনি একজন কাল্পনিক কন্সটেবলের উপর ভাঁটার মত চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া অজস্র গালিবর্ষণ করিতে করিতে কোথায় যে অন্তর্হিত হইলেন তাহা আমরা খুঁজিয়াও পাইলাম না।

পুলিস কোর্টের লীলা সাঙ্গ হইবার পর আমাদের গাড়ীতে পুরিয়া আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হাজির করা হইল। ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে রাস্তায় পুলিস কর্ম্মচারীরা আমাদের দুই খানা করিয়া কচুরী ও একটা করিয়া সিঙ্গাড়া খাইতে দিয়াছিলেন, এমন কি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে statement করিবার সময় গলা যাহাতে না শুকাইয়া যায় সেই জন্য কাহাকে কাহাকেও এক এক গ্লাস জল পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন! তবে সেটা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ধমক খাইবার পর।

কোর্টে গিয়া দেখিলাম ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লি (Birley) সাহেব বিকট

বদনে উঁচু তক্তের উপর বসিয়া আছেন। মুখখানি যেন সাদা মার্বেল পাথর দিয়া বাঁধান। দেখিলে মনে হয় যেন একটী মূর্ত্তিমান শাসনযন্ত্র। তিনি আমাদের **Statement** গুলি লিখিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি মনে কর তোমরা ভারতবর্ষ শাসন করিতে পার?"

কথাটা শুনিয়া এত দুঃখের মধ্যেও একটু হাসি আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"সাহেব, দেড়শ বৎসর পূর্ব্বে কি তোমরা ভারত শাসন করিতে? না, তোমাদের দেশ হইতে আমরা শাসনকর্ত্তা ধার করিয়া আনিতাম?"

সাহেবের বোধ হয় উত্তরটা তত ভাল লাগিল না। তিনি খবরের কাগজের সংবাদদাতাদের বারণ করিয়া দিলেন যে, আমাদের সহিত তাঁহার এ সমস্ত কথাবার্ত্তাগুলা যেন ছাপা না হয়।

কোর্ট হইতে গাড়ীবন্ধ হইয়া যখন আলিপুর জেলের দরজার কাছে হাজির হইলাম তখন সন্ধ্যা। জেল তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে: অন্ন-ব্যঞ্জনও প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু জেলার বাবু কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া এক এক মুঠা ভাত ও একটু করিয়া ডাল আমাদের খাইতে দিলেন। প্রায় দুই দিন অনাহারের পর সেই এক মুঠা ভাতই যেন অমৃত বলিয়া মনে হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যে রাত্রে জেলে গিয়া পৌছিলাম, সে রাত্রে আর ভালমন্দ কিছু ভাবিবার মতো অবস্থা আমাদের ছিল না। ধরা পড়িবার পর বারীন্দ্র বলিয়াছিল—**My mission is over**—আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে!—কিন্তু সে-কথার প্রতিধ্বনি ত নিজের মধ্যে একটুও খুঁজিয়া পাইলাম না! দেশের কাজ ত সবই বাকি!—শুধু আমার কাজই ফুরাইয়া গেল! প্রাণভরা সহস্র আকাঙ্ক্ষা, কত কি বিচিত্র কল্পনা লইয়া যুগান্তর গড়িতে নামিয়াছিলাম—এক ভূমিকম্পে সবটাই ধূলিসাৎ হইয়া গেল! এ জগতে শুধু পাহারাওয়ালার লাল পাগড়ীটাই সত্য, আর বাকি সবটাই মায়া? অতীতের কত স্মৃতি তুবড়ী বাজীর মত মাথায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। মনে পড়িল তিন চার মাস দেশময় টো টো করিয়া ঘুরিয়া যখন শীর্ণ ক্লান্ত দেহভার লইয়া একদিন বাড়ীতে ফিরিয়াছিলাম তখন মা আমার মুখের দিকে চাহিয়া অভিমান ভরে বলিয়াছিলেন—"ছেলের আমার আর মায়ের রান্না ভাত ভাল লাগে না! কোথায় দীন দুঃখীর মত ঘুরে ঘুরে বেড়াস, বাবা! 'ভদ্দর নোকের' ছেলে; শেষে কি কোন্ দিন পুলিসে ধরে 'অপমান্যি' করবে!"—আজ সত্য সত্যই পুলিসে ধরিয়া 'অপমান্যি' করিল! আবার মনে পড়িল সেই পাহারাওয়ালার কথা যে আসিতে আসিতে বলিয়াছিল—"বাবুজী তোমরা যদি একটা কিছু গোলাগুলি ছুঁড়তে, তাহলে আমরা সবাই পালিয়ে যেতুম।" তাইত! চুপচাপ একেবারে ভেড়ার দলের মতো ধরা পড়িলাম। এ দুঃখ যে মরিলেও ঘুচিবে না! একজন পুলিস সার্জ্জেণ্ট ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল—"এরা এমনি সুবোধ ছেলে যে

বাগানে ঘুমাইবার সময় রাস্তায় একজন পাহারা পর্য্যন্ত রাখে নাই।” কথাটা সারারাত মাথার ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু এখন আর হাত কামড়ান ছাড়া উপায় নাই। একবার উল্লাসের উপর রাগ ধরিল। পুলিসের দল যখন প্রথম বাগানে আসিয়া ঢুকে, তখন সে জাগিয়া উঠিয়াছিল; ইচ্ছা করিলে সে পলাইতেও পারিত; কিন্তু নির্ব্বিকার সাক্ষীস্বরূপ ব্রহ্ম পুরুষের ন্যায় সে ব্যাপারটা চুপ চাপ বসিয়া দেখিয়াছিল মাত্র; পলাইবার কথা তাহার মনে আসে নাই!

সে রাতটা এই রকম দুশ্চিন্তায় কাটিয়া গেল। সকালে উঠিয়া কুঠরীর (cell) বাহিরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম—নরক একেবারে গুলজার। আমাদের সব আড্ডাগুলির ছেলেরাই আসিয়া জুটিয়াছে। অধিকন্তু পাঁচ সাতজন অপরিচিত ছেলেও দেখিলাম। ইহারা আবার কোথাকার আমদানী? একটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“বাপু হে, তুমি কে বট?”

ছেলেটী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—“আজ্ঞে আমার বাড়ী মাণিকতলায়। আপনাদের বাগানের কাছে সকালবেলা একটু মর্ণিং ওয়াক করাটা যে এত বড় মহাপাপ তা’ত জানতুম না।”

দেখিলাম নগেন সেনগুপ্ত আর তাহার ভাই ধরণীকেও পুলিস জেলে পুরিয়াছে। বেচারারা বোমার ‘ব’ পর্য্যন্ত জানে না। পুলিসে বোমার আড্ডার সন্ধান পাইয়াছে ভাবিয়া উল্লাসকর বোমাগুলি কোথায় সরাইয়া রাখিবে স্থির করিতে না পারিয়া বাল্যবন্ধু নগেনের বাড়ীতে একটা বোমার প্যাটরা রাখিয়া আসিয়াছিল। প্যাটরার ভিতর যে সাপ আছে কি ব্যাঙ আছে, নগেন বা ধরণী তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিত না। তাহাদের বাঁচাইবার জন্যই উল্লাস পুলিসের নিকট সব কথা স্বীকার করিল। উল্লাসের বিশ্বাস ছিল যে সত্য কথা জানিতে পারিলেই পুলিসের কর্ত্তারা নগেন ও ধরণীর উপর আর মোকদ্দমা চালাইবে না।

পুলিস যে ঠিক ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের বংশ-সম্ভূত নয় এ কথাটা তখন উল্লাসের মাথায় ভাল করিয়া ঢুকে নাই।

ক্রমে পুলিস নানা জেলা হইতে অনেকগুলি ছেলে আনিয়া হাজির করিল। শ্রীহট্ট হইতে সুশীল সেন ও তাহার দুই ভাই বীরেন ও হেমচন্দ্র আসিল। সুশীলকে আমরা পূর্ব্বে চিনিতাম কিন্তু তাহার দুই ভাইকে ইহার পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। মালদহ হইতে কৃষ্ণজীবন, যশোহর হইতে বীরেন ঘোষ ও খুলনা হইতে সুধীরও আসিয়া পৌছিল।

আর আসিয়া পৌছিলেন আমার পুরাতন বন্ধু পণ্ডিত হৃষীকেশ। হৃষীকেশ আমার কলেজের সহপাঠী। কলেজ হইতে মা ইংরাজী সরস্বতীকে বয়কট করিয়া আমি যখন সাধুগিরি করিতে বাহির হই, তখন পণ্ডিত হৃষীকেশ ভাবাধিক্যবশতঃ নিমতলার ঘাটে গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে সমস্ত সৎকর্ম্মে সে আমার সহগামী হইবে। এক নিমতলার ঘাট—মহাতীর্থ বলিলেই হয়; তাহার উপর মা গঙ্গা—একেবারে জাগ্রত দেবতা। সেখানকার প্রতিজ্ঞা কি আর বিফল হইবার জো আছে? মা গঙ্গা কি কুক্ষণেই তাহার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া মনে মনে 'তথাস্তু' বলিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু সেইদিন হইতে আজ অবধি পণ্ডিত হৃষীকেশ আমার পিছনেই লাগিয়া আছে। শাস্ত্রে বলে যে উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে ও শ্মশানে যে একসঙ্গে গিয়া দাঁড়ায়, সেই বান্ধব। হৃষীকেশের বিবাহে ও তাহার পুত্রের অন্নপ্রাশনে আমি লুচি খাইয়া আসিয়াছি, দুর্ভিক্ষের সময় দুজনে পীড়িতের সেবা করিয়াছি; এক সঙ্গে উভয়ে সাধুগিরি করিয়া ফিরিয়াছি, মাষ্টারীও করিয়াছি। আজ রাষ্ট্রবিপ্লব করিতে গিয়া একসঙ্গে উভয়ে পুলিসের হাতে ধরাও পড়িলাম। ভবিষ্যতে যে উভয়কে একসঙ্গে শ্রীধাম আন্দামান বাস করিতে হইবে, তাহা তখন জানিতাম না। বান্ধবত্বের সব লক্ষণই

মিলিয়াছে; বাকি আছে শুধু শ্মশানটুকু। নিমতলার ব্রতটুকু এখন নিমতলায় উদ্‌যাপন করিয়া আসিতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

যাক, সে ভবিষ্যতের কথা। জেলে গিয়া দুই দিন বিশ্রাম করিতে না করিতেই দেখি পণ্ডিত হৃষীকেশ বিশাল দেহভার দোলাইতে দোলাইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাহার সহিত মাণিকতলার বাগানের কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না; আমাদের কার্য্যকলাপের কিছু কিছু সে জানিত মাত্র। তাহার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন প্রমাণও ছিল না। বাগানের কাগজ-পত্রের মধ্যে দু এক জায়গায় তাহার নাম পাইয়া পুলিস সন্দেহ করিয়া তাহাকে ধরিয়াছিল। কিন্তু গঙ্গাজল ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা ত আর বিফল হইবার নয়! তাহাকে যে আন্দামানে যাইতেই হইবে! পুলিস যখন তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া গিয়া হাজির করে তখন তাহার ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মত গোলগাল নাদুসনুদুস চেহারা দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের তাহাকে নিরপরাধ বলিয়াই ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখ দেখিয়াই বন্ধুর আমার মেজাজটা একেবারে বিগড়াইয়া গেল। মহামান্য সরকার বাহাদুরের রাজ্য ও শাসননীতি সম্বন্ধে বন্ধু আমার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আর এখানে পুনরুদ্ধৃত করিয়া এ বৃদ্ধ বয়সে বিপদে পড়িবার আমার ইচ্ছা নাই। পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট ফুলার সাহেবের টম-ফুলারির (tom foolery) আলোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া লাট মরলীর পিতৃ-শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে সবই ছিল। পণ্ডিতজীর বক্তৃতা শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে জেলের মধ্যে এক পৃথক কুঠরীতে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার রাজনৈতিক মতামতের সংস্কার করিতে আদেশ দিলেন।

সপ্তাহের মধ্যে আসিয়া হাজির হইলেন শ্রীমান দেবব্রত। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি যুগান্তরের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া নবশক্তির সম্পাদকের কাজ করিয়াছিলেন। নবশক্তি উঠিয়া যাওয়ার পর আপনার সাধন ভজন লইয়াই বাড়ীতে বসিয়া থাকিতেন। বাহিরের লোকের সহিত বড একটা দেখাশুনা করিতেন না। চলমান পর্ব্বতবৎ তিনিও একদিন সুপ্রভাতে জেলে আসিয়া হাজির হইলেন।

পুলিস কোর্টে শুনিয়াছিলাম যে আমরা যে-দিন ধরা পড়ি সে-দিন অরবিন্দ বাবুকেও ধরা হইয়াছিল। কিন্তু আমরা জেলের যে অংশে আবদ্ধ ছিলাম সেখানে তাঁহার দেখা পাইলাম না। শুনিলাম তাঁহাকে অন্যত্র আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

হৃষীকেশকে যে দিন পুলিস ধরিয়া আনে তাহার দুই একদিন আগে শ্রীরামপুর হইতে গোস্বামীদের বাড়ীর নরেন্দ্রকেও ধরিয়া আনিয়াছিল। সে আমাদের সহিত এক জায়গায় আবদ্ধ ছিল।

আমাদের বাগানে একখানা নোটবুকে একটা নাম লেখা ছিল—চারুচন্দ্র রায়-চৌধুরী। খুলনার ইন্দুভূষণকে আমরা চারু বলিয়া ডাকিতাম। পুলিস তাহা না জানিয়া চারুচন্দ্র রায়-চৌধুরীকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষে স্থির করিল যে চন্দননগরে ডুপ্লে কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ই ঐ চারুচন্দ্র রায়-চৌধুরী। চারুবাবুর বোধ হয় অপরাধ যে কানাইলাল দত্ত ও আমি উভয়েই তাঁহার ছাত্র ও উভয়েরই বাড়ী চন্দননগর। যাঁহার ছাত্রেরা এমন রাজদ্রোহী, তিনি 'রায়'ই হোন, আর 'রায় চৌধুরী'ই হোন তাহাতে কি আসিয়া যায়? তাঁহাকে ত ধরিতেই হইবে!

যাক্ সে কথা। অল্পদিনের মধ্যেই এক এক করিয়া পুলিশ প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশজন লোককে হাজতে টানিয়া আনিল। তিন চারটা

কুঠরীতে তিন তিন জন করিয়া রাখিল; বাকি সকলের জন্য পৃথক পৃথক কুঠরীর ব্যবস্থা হইল।

ধরাপড়ার উত্তেজনা সামলাইতেই প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম একটী প্রায় সাত হাত লম্বা পাঁচ হাত চওড়া কুঠরীর মধ্যে আমরা তিনটী প্রাণী আবদ্ধ আছি। আমি ছাড়া দুইটীই ছেলে মানুষ; একটীর বয়স বছর কুড়ি আর একটীর বয়স পনেরো। প্রথমটী নলিনীকান্ত গুপ্ত—প্রেসিডেন্সী কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, নিতান্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির ভাল ছেলে; আর দ্বিতীয়টি শচীন্দ্রনাথ সেন—ন্যাশন্যাল কলেজের পলাতক ছাত্র—একেবারে শিশু বা বাচ্ছা বলিলেই হয়। সেই কুঠরীর এক কোণে শৌচ প্রস্রাবের জন্য দুইটী গামলা। তিন জনকেই সেইখানে কাজ সারিতে হয়; সুতরাং এক-জনকে ঐ অবশ্য কর্ত্তব্য অশ্লীল কর্ম্মটুকু করিতে গেলে আর দুই জনের চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কুঠরীর সামনে একটী ছোট বারান্দা। সেইখানে হাত মুখ ধুইবার ও স্নানাহার করিবার ব্যবস্থা। বারান্দার সামনে সরু লম্বা উঠান, আর তাহার পরেই অভ্রভেদী প্রাচীর। প্রাচীরটা ছিল আমাদের চক্ষুশূল। সেটা যেন অহরহঃ চীৎকার করিয়া বলিত—"তোমরা কয়েদী, তোমরা কয়েদী। আমার হাতে যখন পড়িয়াছ তখন আর তোমাদের নিস্তার নাই।"

প্রাচীরের উপর দিয়া খানিকটা আকাশ ও একটা অশ্বত্থ গাছের মাথা দেখিতে পাওয়া যাইত। জেলখানার কবিত্ব কেবল এইটুকু লইয়াই; বাকি সবটাই একেবারে নিরেট গদ্য। আর সব চেয়ে কটমটে গদ্য আহারের ব্যবস্থাটা। প্রথম দিন তাহা দেখিয়া হাসি পাইল, দ্বিতীয় দিন রাগ ধরিল, তৃতীয় দিন কান্না আসিল। সকাল বেলা উঠিতে না উঠিতেই একটা প্রকাণ্ড কালো জোয়ান বালতি হইতে সাদা সাদা কি

খানিকটা আমাদের লোহার থালার উপর ঢালিয়া দিয়া গেল। শুনিলাম, উহাই আমাদের বাল্যভোগ এবং আলীপুরী ভাষায় উহার নাম 'লপ্‌সী'। লপ্‌সী কিরে বাবা! শচীন দূর হইতে খানিকটা পরীক্ষা করিয়া বলিল,—"ওহো! এ যে ফেন মিশান ভাত!"—পরদিন দেখিলাম ডালের সহিত মিশিয়া লপ্‌সী পীতবর্ণ ধরিয়াছে; তৃতীয় দিন দেখিলাম উহা রক্তবর্ণ। শুনিলাম উহাতে গুড় দেওয়া হইয়াছে এবং উহাই আমাদের প্রাতরাশের রাজ সংস্করণ। সাড়ে দশটার সময় একটা টীনের বাটীর এক বাটী রেঙ্গুন চালের ভাত, খানিকটা অরহর ডাল, কি খানিকটা পাতা ও ডাঁটা সিদ্ধ ও একটু তেঁতুল গোলা। সন্ধ্যার সময়ও তদ্বৎ, কেবল তেঁতুল গোলাটুকু নাই।

ডাক্তার সাহেব ও জেলার বাবু আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিবামাত্র আমরা একটা প্রকাণ্ড উদরনৈতিক আন্দোলন সুরু করিয়া দিলাম। ডাক্তার সাহেব জাতিতে আইরিস, নিতান্ত ভদ্রলোক; আমাদের সব কথাগুলি চুপ করিয়া শুনিয়া বলিলেন—"উপায় নাই। জেলের কয়েদীর খোরাক একেবারে সরকারের হিসাব মত বাঁধা। কাহারও অসুখ-বিসুখ হইলে তিনি হাঁসপাতাল হইতে পৃথক বন্দোবস্ত করিতে পারেন; কিন্তু সুস্থ অবস্থায় অন্য আহার দিবার অধিকার তাঁহার নাই। জেলার বাবু বলিলেন,—"জেলের বাগানে আলু বেগুন কুমড়া পেঁয়াজ প্রভৃতি সব তরকারীই ত হয়; জেলের খোরাক মন্দ নয়। শচীন নিতান্ত ঠোঁটকাটা ছেলে; সে বলিল—"বাগানে ত হয় সবই; কিন্তু পুঁই ডাঁটা আর এঁচোড়ের খোসা ছাড়া বাকি সব গুলা বোধ হয় রাস্তা ভুলিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়।"

দেখিলাম অসুখ করা ছাড়া আর বাঁচিবার উপায় নাই। কাজেই আমাদের সকলকার অসুখ করিতে লাগিল। নিত্য নিত্য নূতন

অসুখ কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যায়? পেট কামড়ান, মাথা ধরা, বুক দুড় দুড় করা, গা বমি বমি করা সবই যখন একে একে ফুরাইয়া আসিল তখন বাহিরে প্রকাশ পায় না এমন অসুখ আবিষ্কারের জন্য আমাদের মাথা ঘামিয়া উঠিল। রোগ ত একটা কিছু চাই—তা না হইলে প্রাণ যে বাঁচে না। ডাক্তার সাহেব আসিলে পণ্ডিত হৃষীকেশ গম্ভীর ভাবে জানাইলেন যে, তাঁহার বামচক্ষুর উপরের পাতা তিনদিন ধরিয়া নাচিতেছে, সুতরাং তিনি যে কঠিন পীড়াগ্রস্ত সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার মনে হইতেছে যে, হাসপাতালের অন্ন ভিন্ন তাঁহার বাঁচিবার আর উপায় নাই। ডাক্তার বেচারা হাসিয়া তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গেলেন।

হঠাৎ আমরা আরও একটা পথ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। সেটা এই, যে, পয়সা থাকিলে জেলখানার মধ্যে বসিয়াই সব পাওয়া যায়। জেলের প্রহরী ও পাচকের হাতে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিতে পারিলেই ভাতের ভিতর হইতে কৈমাছ ভাজা ও রুটির গাদার ভিতর হইতে আলু পেঁয়াজের তরকারী বাহির হইয়া আসে; এমন কি পাহারাওয়ালার পাগড়ীর ভিতর হইতে পান ও চুরুট বাহির হইতেও দেখা গিয়াছে।

একটা মহা অসুবিধা ছিল এই যে, এক কুঠরীর লোকের সহিত অপর কুঠরীর লোকের কথা কহিবার হুকুম ছিল না। প্রথমে লুকাইয়া লুকাইয়া এক আধটা কথা কওয়া হইত; তাহাতে পাহারাওয়ালাদের ঘোরতর আপত্তি! তাহারা জেলারের কাছে রিপোর্ট করিবার ভয় দেখাইতে লাগিল। হঠাৎ কিন্তু একদিন দেখা গেল তাহারা বেশ শান্ত শিষ্ট হইয়া গিয়াছে; আমরা চীৎকার করিয়া কথা কহিলেও আর তাহারা শুনিতে পায় না। অনুসন্ধানে জানা গেল আমাদের একজন বন্ধু রৌপ্য

খণ্ড দিয়া তাহাদের কানের ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। জেলার বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিবার সময় তাহারাই আমাদের সতর্ক করিয়া দিতে লাগিল। রৌপ্যখণ্ডের যে অনন্ত মহিমা তাহা এতদিন কানেই শুনিয়াছিলাম, এইবার তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া মানব জন্ম সফল হইল। কিন্তু একটা দুঃখ কতকটা ঘুচিতে না ঘুচিতে আর এক দুঃখ দেখা দিল।

আমরা জেলে আসিবার পর হইতেই জেলের মধ্যে সি-আই-ডির কর্ত্তাদিগের শুভাগমন আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিলে মনে হইত যেন আমাদের বীরত্বের গৌরবে তাঁহাদের বুক ফুলিয়া দশ হাত হইয়াছে, আমাদের সহিত সহানুভূতিতে প্রাণ যেন তাঁহাদের ফাটি-ফাটি। কথাগুলি তাঁহাদের এমনি মোলায়েম, হাব-ভাব এমনি চিত্তবিমোহন যে দেখিলে শুনিলেই মনে হইত ইহারা আমাদের পূর্ব্ব-জন্মের পরমাত্মীয়। তবে ধরা পড়িবার পরদিন তাঁহাদের ঘরে এ রাত্রি বাস করিয়া এসব ছলাকলার পরিচয় অনেক পূর্ব্বেই পাইয়াছিল। —তাই রক্ষা। ইহারা সপ্তাহ খানেক যাতায়াতের পর নরেন্দ্র গোস্বামী যেন হঠাৎ একটু বেশী অনুসন্ধিৎসু হইয়া দাঁড়াইল। বাংলা ছাড়া ভারতের অন্য কোথাও বিপ্লবের কেন্দ্র আছে কি না, আর থাকিলে সেখানকার নেতাদের নাম কি—ইত্যাদি অনেক রকম প্রশ্নই সে আমাদের জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। জেলের কর্ত্তৃপক্ষের এক আধ জনের কথাবার্ত্তায়ও বুঝিলাম—একটা গোলমাল কোথাও লাগিয়াছে।

হৃষীকেশ একদিন আসিয়া আমায় বলিল—“গোটা দুই তিন বেয়াড়া রকমের মাদ্রাজী বা বর্গি টর্গির নাম বানিয়ে দিতে পারিস্?

“কেন?“

"নরেন বোধ হয় পুলিসকে খবর দিচ্ছে; গোটা কতক উদ্ভট রকমের নাম বানিয়ে দিতে পারলে স্যাঙ্গাতরা দেশময় অশ্বডিম্ব খুঁজে খুঁজে বেড়াবে খ'ন।" তাহাই হইল; মহারাষ্ট্রীয় কেন্দ্রের সভাপতি হইলেন শ্রীমান পুরুষোত্তম নাটেকার, গুজরাতের সভাপতি হইলেন কিষণজী ভাওজী বা এই রকম একজন কেহ; কিন্তু মাদ্রাজের ভার লইবেন কে? মাদ্রাজী নাম যে তৈয়ারী করা শক্ত! খবরের কাগজে তখন চিদম্বরম্ পিলের নাম দেখা গিয়াছিল। হৃষীকেশ বলিল, যখন চিদম্বরম্ মাদ্রাজী নাম হইতে পারে তখন বিশ্বম্ভরম্ কি দোষ করিল? আর পিলের বদলে যকৃৎ বা অমনি একটা কিছু জুড়িয়া দিলেই চলিবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নানা প্রকারের জল্পনা কল্পনা চলিতেছে এমন সময় হঠাৎ একদিন আমাদের অদৃষ্ট খুলিয়া গেল। জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ হুকুম দিলেন যে ৪৪ ডিগ্রী হইতে অন্যস্থানে লইয়া গিয়া আমাদের একত্র রাখা হইবে। ভাগ্য-বিধাতা সহসা প্রসন্ন হইয়া কেন উঠিলেন তাহা তিনিই জানেন; কিন্তু আমরা ত হাসিয়াই খুন! আলিঙ্গন, গলা জড়াজড়ি, লাফালাফি আর চীৎকার থামিতেই এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তাহার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম যে, তিনটি পাশাপাশি কুঠরীতে আমাদের রাখা হইয়াছে; তাহার মধ্যে পাশের দুইটা কুঠরী ছোট; আর মাঝেরটা অপেক্ষাকৃত বড়। অরবিন্দ বাবু ও দেবব্রতের মত যাঁহারা অপেক্ষাকৃত গম্ভীর-প্রকৃতি তাঁহারা পাশের দুইটী কুঠরীতে আশ্রয় লইলেন; আর আমাদের মত "চ্যাংড়া" যাহারা, তাহারা মাঝের বড় কুঠরীটি দখল করিয়া সর্ব্বদিনব্যাপী মহোৎসবের আয়োজন করিতে লাগিল। মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কানুনগো আমাদের

সঙ্গে আসিয়া জুটিলেন। হেমচন্দ্রের সহিত পূর্ব্বে কখনো বিশেষ ভাবে পরিচিত হইবার অবসর পাই নাই; এবার কাছে আসিয়া দেখিলাম, যে, যাঁহাদের মাথার চুল পাকে, বুদ্ধিও পাকে, কিন্তু বয়স বাড়ে না, হেমচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। অসাধারণ শক্তিমত্তার সহিত বালসুলভ তরলতা মিশিলে যে অদ্ভুত চরিত্রের সৃষ্টি হয়, হেমচন্দ্রের তাহাই ছিল। দুই একদিনের মধ্যেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে তিনি সাধারণের "হেমদা" হইয়া দাঁড়াইলেন। আমাদের পাশের দুইটি ঘরে লেখাপড়া ও ধর্ম্মালোচনা চলিতে লাগিল; আর আমাদের ঘরটী হইয়া উঠিল নাচ, গান, হাসি, ঠাট্টা, তামাসা ও চিমটি কাটাকাটির কেন্দ্র। বলা বাহুল্য উল্লাসকর আমাদের সহিত একত্রই ছিল। সে না থাকিলে আসর জমিত না। আমরা বাড়ীঘর ছাড়িয়া যে জেলে আসিয়াছি হট্টগোলের মধ্যে সে কথা মনেই হইত না।

দিন কয়েক পরে সুখের মাত্রা আরও এক পর্দ্দা চড়িয়া গেল। বাহির হইতে পুলিশ আরও কয়েক জনকে ধরিয়া আনিল। মোট আমরা প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন হইলাম। এত লোককে তিনটী কুঠরীর মধ্যে পুরিতে গেলে অন্ধকূপহত্যার পুনরভিনয় করিতে হয়! ডাক্তার সাহেব বলিলেন যে, একটা ওয়ার্ড খালি করিয়া আমাদের সকলকে সেখানে রাখা হোক। কাজে কাজেই সকলে আসিয়া একসঙ্গে মিশিলাম। নরক একেবারে গুলজার হইয়া উঠিল।

জেলের খাওয়া সম্বন্ধে নানারূপ অভিযোগ করায় ডাক্তার সাহেব আমাদের জন্য বাহির হইতে ফল মূল বা মিষ্টান্ন পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। সুশীল সেনের পিতা প্রায়ই আম, কাঁঠাল ও মিষ্টান্ন পাঠাইয়া দিতেন। কলিকাতার অনুশীলন সমিতির ছেলেরাও মাঝে মাঝে ঘি, চাল, মসলা ও মাংস পাঠাইয়া দিত। সর্ব্ববিদ্যাসিদ্ধ "হেমদা"

সেগুলি হাসপাতালে লইয়া গিয়া পোলাও বানাইয়া আমাদের ভুরি-ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। আম কাঁঠাল এত অধিক পরিমাণে আসিত যে, খাইয়া শেষ করা দায় হইত; সুতরাং সেগুলি পরস্পরের মুখে ও মাথায় মাখাইয়া সদ্ব্যবহার করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না।

সন্ধ্যার সময় গানের আড্ডা বসিত। হেমচন্দ্র, উল্লাসকর, দেবব্রত কয় জনেই বেশ গাহিতে পারিত; কিন্তু দেবব্রত গম্ভীর পুরুষ—বড় একটা গাহিতনা! অনেক পীড়াপীড়িতে একদিন তাহার স্বরচিত একটা গান আমাদের শুনাইয়াছিল। ভারত-ব্যাপী একটা বিপ্লবকে লক্ষ্য করিয়াই তাহা রচিত। তাহার সুরের এমন একটা মোহিনী শক্তি যে, গান শুনিতে শুনিতে বিপ্লবের রক্তচিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে যেন স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিত। গান বা পদ্য কস্মিনকালেও আমার বড় একটা মনে থাকে না, কিন্তু দেবব্রতের সেই গানটার দুই এক ছত্র আজও মনে গাঁথিয়া আছে—

"উঠিয়া দাঁড়াল জননী!
কোটী কোটী সুত হুঙ্কারি দাঁড়াল!

* * *

রক্তে আঁধারিল রক্তিম সবিতা
রক্তিম চন্দ্রমা তারা,
রক্তবর্ণ ডালি রক্তিম অঞ্জলি
বীর রক্তময়ী ধরা কিবা শোভিল!

গানটা শুনিতে শুনিতে মানস-চক্ষে বেশ স্পষ্টই দেখিতাম যে, হিমাচলব্যাপী ভাবোন্মত্ত জনসঙ্ঘ বরাভয়করার স্পর্শে সিংহগর্জ্জনে জাগিয়া উঠিয়াছে; মায়ের রক্ত-চরণ বেড়িয়া বেড়িয়া গগনস্পর্শী রক্তশীর্ষ উত্তাল তরঙ্গ ছুটিয়াছে; দ্যুলোক ভূলোক সমস্তই উন্মত্ত রণ-

বাত্মে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। মনে হইত যেন আমরা সর্ব্ববন্ধনমুক্ত—দীনতা, ভয়, মৃত্যু আমাদের কখন স্পর্শও করিতে পারিবে না।

ছেলেরা অনেকেই সেকালের স্বদেশী গান গাহিত। তাহাদের অদম্য উৎসাহ আর স্ফূর্ত্তি চাপিয়া রাখাই দায়। শচীন সেন ছিল তাহাদের অগ্রণী। পনেরো বৎসর যখন তাহার বয়স তখন সে মা-বাপের কথা ঠেলিয়া একরূপ জোর করিয়াই কলিকাতা ন্যাশনাল কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হয়। কিন্তু তাহার প্রাণের গভীরতর আকাঙ্ক্ষা কলেজের বিদ্যায় মিটিল না; শেষে বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিয়া সে বাগানে যোগ দিল। জেলে আসিবার পর চীৎকার করিয়া, লাফালাফি করিয়া গান গাহিয়া, কাঁধে চড়িয়া, আম কাঁঠাল চুরি করিয়া সে যে শুধু আমাদেরই অস্থির করিয়া তুলিল তাহা নহে; জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণও তাহার বক্তৃতার ও গানের জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। রাত বারোটা একটা বাজিয়া চলিয়াছে, শচীনের গানের আর বিরাম নাই! জেলার বাবুটী নিতান্ত ভদ্রলোক। এতগুলা ভদ্রলোকের ছেলেকে তাঁহার জেলের মধ্যে পুরিয়া দেওয়ায় তিনি নিতান্তই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদিকে সরকারী চাকরী, পেন্সন পাইবার আর বৎসর খানেক মাত্র বিলম্ব—আর অপর দিকে চক্ষুলজ্জা—এই দোটানায় পড়িয়া বেচারার একেবারে প্রাণান্ত! একে ভদ্রলোক প্রৌঢ় বয়সে চতুর্থ না পঞ্চম পক্ষের পাণিপীড়ণ করিয়াছেন, তাহার উপর রাত্রিকালে ছেলেদের গানের জ্বালায় অস্থির! একদিন প্রাতঃকালে তিনি নিতান্ত ভাল মানুষের মত আসিয়া নিবেদন করিলেন যে, ছেলেদের বুঝাইয়া সুঝাইয়া যেন আমরা একটু শান্ত করিয়া রাখি। কেন-না রাত্রিকালে গৃহিণীর ও মশকের উপদ্রবের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের গানের উপদ্রব আসিয়া জুটিলে তাঁহার আর এক বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া পেন্সন ভোগ

করিবার সুবিধা মিলিবে না। এ হেন সদ্যুক্তির পর আর কি করা যায়? কথামালা ও শিশুশিক্ষা হইতে উদ্ধৃত করিয়া অনেকগুলি ভাল ভাল উপদেশ ছেলেদের শুনাইয়া দিয়া যথাসাধ্য কর্ত্তব্যপালন করিলাম; কিন্তু সদুপদেশ মত কার্য্য করিবার বুদ্ধিশুদ্ধিই যদি তাহাদের থাকিবে তাহা হইলে আর ভারত-উদ্ধার করিবার কুপ্রবৃত্তি তাহাদের স্কন্ধে চাপিবে কেন?

অরবিন্দ বাবু, দেবব্রত ও বারীন্দ্র ভিন্ন আর সকলেই এই হট্টগোলে যোগ দিত; তবে মধ্যে মধ্যে উঁহারাও যে বাদ পড়িতেন—তাহা নহে। ধরা পড়িবার পর বারীন্দ্রের মনে কোথায় একটা বিষম ধাক্কা লাগিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, সে প্রায় সমস্ত দিন একখানা চাদর মুড়ি দিয়া লম্বা হইয়া পড়িয়া থাকিত। দেবব্রত সকালে উঠিয়া পায়ের উপর পা তুলিয়া দিয়া সেই যে অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া বসিত, বেলা দশটা পর্য্যন্ত তাহাকে আর নাড়িবার উপায় ছিল না। আহারাদির পর আবার বেলা চার পাঁচটা পর্য্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত; কখনও বা গীতা ও ভাগবত পড়িত। তাহার সময় এইরূপেই কাটিয়া যাইত। অরবিন্দ বাবুর জন্য একটা কোণ নির্দ্দিষ্ট ছিল। সমস্ত প্রাতঃকাল তিনি সেইখানে আপনার সাধন ভজনের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। ছেলেরা চীৎকার করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিলেও কোন কথাই কহিতেন না। অপরাহ্নে দুই তিন ঘণ্টা পায়চারী করিতে করিতে উপনিষদ বা অন্য কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতেন। তবে সন্ধ্যাবেলায় এক আধ ঘণ্টার জন্য ছেলেখেলায় যোগ না দিলে তাঁহারও নিষ্কৃতি ছিল না।

কানাইলাল প্রভৃতি চার পাঁচজন নিদ্রার কাজটা সন্ধ্যার পরেই সারিয়া লইত। রাত ১০টা ১১টার সময় সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়িত তখন তাহারা বিছানা ছাড়িয়া কাহার কোথায় সন্দেশ, আম

বা বিস্কুট লুকান আছে তাহার সন্ধান করিয়া ফিরিত। যে দিন সে সব কিছু মিলিত না, সে দিন এক গাছা দড়ি দিয়া কাহারও হাতের সহিত অপরের কাছা বা কাহারও কানের সহিত অপরের পা বাঁধিয়া দিয়া ক্ষুণ্ণমনে শুইয়া পড়িত। একদিন রাত্রে প্রায় ১টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি কানাই একজনের বিছানার চাদরের তলা হইতে একটা বিস্কুটের টিন চুরি করিয়া মহানন্দে বগল বাজাইতেছে। অরবিন্দ বাবু পাশেই শুইয়াছিলেন। আনন্দের সশব্দ অভিব্যক্তিতে তাঁহারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কানাই অমনি খানকয়েক বিস্কুট লইয়া তাঁহার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিল। বিস্কুট লইয়া অরবিন্দ বাবু চাদরের মধ্যে মুখ লুকাইলেন; নিদ্রাভঙ্গের আর কোন লক্ষণই দেখা গেল না! চুরিও ধরা পড়িল না।

রবিবারে আমাদের স্ফূর্ত্তির মাত্রা একটু বাড়িয়া যাইত। আত্মীয়-স্বজন ও বাহিরের অনেক লোক আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন সুতরাং অনেক প্রকার সংবাদাদি পাওয়া যাইত। মিষ্টান্নও যথেষ্ট পরিমাণে মিলিত। বিপুল হাস্যরসের মাঝে মাঝে একটু আধটু করুণ রসও দেখা দিত। শচীনের পিতা একদিন তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। জেলে কি রকম খাদ্য খাইতে হয় জিজ্ঞাসা করায় শচীন লপ্‌সীর নাম করিল। পাছে লপ্‌সীর স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া তাহার পিতার মনে কষ্ট হয় সেই ভয়ে শচীন লপ্‌সীর গুণগ্রাম বর্ণনা করিতে করিতে বলিল—"লপ্‌সী খুব পুষ্টিকর জিনিস।" পিতার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। তিনি জেলার বাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"বাড়ীতে ছেলে আমার পোলাওএর বাটি টান মেরে ফেলে দিত; আর আজ লপ্‌সী তার কাছে পুষ্টিকর জিনিস!" ছেলের এ অবস্থা দেখিয়া বাপের মনে যে কি হয় তাহা তখনও ভাল করিয়া বুঝি

নাই, তবে তাহার ক্ষীণ আভাষ যে একেবারে পাই নাই তাহাও নয়। একদিন আমার আত্মীয়-স্বজনেরা আমার ছেলেকে আমার সহিত দেখা করাইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। ছেলের বয়স্ তখন দেড় বৎসর মাত্র; কথা কহিতে পারে না। হয়ত এ জন্মে তাহার সহিত আর দেখা হইবে না ভাবিয়া তাহাকে কোলে লইবার বড় সাধ হইয়াছিল। কিন্তু মাঝের লোহার রেলিংগুলা আমার সে সাধ মিটাইতে দেয় নাই। কারাগারের প্রকৃত মূর্ত্তি সেইদিন আমার চোখে ফুটিয়াছিল!

এইরূপে ত' সুখে দুঃখে জেলখানায় আমাদের দিন কাটিতে লাগিল। ওদিকে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিচারও আরম্ভ হইয়া গেল। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য; আদালতে উকিল ব্যারিষ্টারের ছড়াছড়ি; কিন্তু আমাদের সে দিকে লক্ষ্য নাই। সবটাই যেন আমাদের চোখে একটা প্রকাণ্ড তামাসা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কত রকম বেরকমের সাক্ষী আসিয়া সত্য মিথ্যার খিচুড়ী পাকাইয়া যাইত; আমরা শুধু শুনিতাম আর হাসিতাম। তাহাদের সাক্ষ্যের সহিত যে আমাদের মরণ বাঁচনের সম্বন্ধ এ কথাটা মনেই আসিত না। স্কুলের ছুটীর পর ছেলেরা যেমন মহাস্ফূর্ত্তিতে বাড়ী ফিরিয়া আসে, আমরাও সেইরূপ আদালত ভাঙ্গিবার পর গান গাহিতে গাহিতে চীৎকার করিতে করিতে গাড়ী চড়িয়া জেলে ফিরিয়া আসিতাম। তাহার পর সন্ধ্যার সময় যখন সভা বসিত তখন বার্লি সাহেব কি রকম ফিরিঙ্গি-বাঙ্গালায় সাক্ষীদের জেরা করে, নর্টন সাহেবের পেন্টুলানটা কোথায় ছেঁড়া আর কোথায় তালি লাগান, কোর্ট ইন্সপেক্টরের গোঁফের ডগা ইঁদুরে খাইয়াছে কি আরসুলায় খাইয়াছে—এই সমস্ত বিষয়ে উল্লাসকর গভীর গবেষণা করিত; আর আমরা প্রাণ ভরিয়া হাসিতাম। কিন্তু এই হাসি পর্ব্বের পর যে একটা প্রকাণ্ড কান্না পর্ব্ব আছে তাহা ভাল করিয়া তখন বুঝি নাই।

নরেন্দ্র গোস্বামীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরা যাহা ভয় করিয়াছিলাম, ফলে তাহাই হইল। বিচার আরম্ভ হইবার দুই চারি দিন পরেই সে সরকারী সাক্ষী হইয়া কাঠগড়ায় গিয়া দাঁড়াইল। তাহার সাক্ষ্যের ফলে চারিদিকে নূতন নূতন খানাতল্লাসী আরম্ভ হইল; আর পণ্ডিত হৃষীকেশের উর্ব্বর-মস্তিষ্ক-প্রসূত মারাঠি ও মাদ্রাজী নেতৃবৃন্দকে আবিষ্কার করিবার জন্য পুলিশ চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

নরেন সরকারী সাক্ষী হইবার পরই তাহাকে আমাদের নিকট হইতে সরাইয়া হাসপাতালে ইউরোপীয় প্রহরীর তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছিল। পাছে কেহ তাহাকে আক্রমণ করে সেই ভয়ে জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ সর্ব্বদাই সাবধান হইয়া থাকিতেন। জেলার বেচারী একদিন বলিলেন—"দেখুন, আমার হয়েছে তালগাছের আড়াই হাত। তালগাছ সবটা চড়া যায়, কিন্তু শেষ আড়াই হাত ওঠবার সময় প্রাণটা বেরিয়ে যায়। এতদিন চাকরী করে এলুম, বেশ নির্ব্বিবাদে কেটে গেল। আর এই পেন্‌সন্ নেবার সময় আপনাদের হাতে গিয়ে পড়েছি। এখন মানে মানে আপনাদের বিদেয় করতে পারলে বাঁচি।" কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস! তালগাছের শেষ আড়াই হাত আর তাঁহাকে চড়িতে হইল না।

ম্যাজিষ্ট্রেট আমাদের মোকর্দ্দমা সেসনে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। আমরাও লম্বা ছুটি পাইলাম। নিষ্কর্ম্মার দল—কাজেই সকলেই হাসে, খেলে, লাফালাফি করে, মোকদ্দমার ফলাফল লইয়া মাঝে মাঝে বিচার-বিতর্কও করে। ছেলেরা কাহাকেও বা ফাঁসিকাঠে চড়ায়, কাহাকেও বা খালাস দেয়। কানাইলাল একদিন বলিল "খালাসের কথা ভুলে যাও, সব বিশ বৎসর করে কালাপানি।" শচীনের তাহাতে ঘোরতর আপত্তি। সে প্রমাণ করিতে বসিল যে, বিশ বৎসরের মধ্যে

দেশ স্বাধীন হইবেই হইবে। কানাইলাল খানিকক্ষণ গম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল—"দেশ মুক্ত হোক আর না হোক, আমি হবো। বিশ বৎসর জেলখাটা আমার পোষাবে না।" এই কথার দুই একদিন পরেই একদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ পেটে হাত দিয়া শুইয়া পড়িয়া সে বলিল যে তাহার পেটে ভারি যন্ত্রণা হইতেছে। ডাক্তার বাবু আসিয়া তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন। সেই অবধি সে হাসপাতালেই রহিয়া গেল। মেদিনীপুরের সত্যেনকে কিছুদিন পূর্ব্বে পুলিস ধরিয়া আনিয়াছিল। কঠিন কাশরোগগ্রস্ত বলিয়া সেও হাসপাতালেই থাকিত।

কানাই হাসপাতালে যাইবার তিন চারি দিন পরেই, একদিন সকালবেলা বিছানা হইতে উঠিয়া আমরা মুখ-হাত ধুইতেছি, এমন সময় হাসপাতালের দিক হইতে দুই একটা বন্দুকের মত আওয়াজ শুনিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম চারিদিক হইতে কয়েদী পাহারা-ওয়ালারা হাসপাতালের দিকে ছুটিতেছে। ব্যাপার কি? কেহ বলিল বাহির হইতে হাসপাতালের উপর গোলা পড়িতেছে, কেহ বলিল সিপাহিরা গুলি চালাইতেছে। হাসপাতালের একজন কম্পাউণ্ডার দুরপাক খাইতে খাইতে ছুটিয়া আসিয়া জেলের অফিসের কাছে শুইয়া পড়িল। ভয়ে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। যে সংবাদ দিবার জন্য সে ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহা তাহার পেটের মধ্যেই রহিয়া গেল! প্রায় দশ পনের মিনিট এইরূপ উৎকণ্ঠায় কাটিল, শেষে একটা পুরাণো চোর ছুটিয়া আসিয়া আমাদের সংবাদ দিল—

"নরেন গোসাই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!"

"ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কি রে?"

"আজ্ঞে, হাঁ বাবু; কানাই বাবু তা'কে পিস্তল দিয়ে ঠাণ্ডা করে

দিয়েছে। ঐ দেখুন গে না—কারখানার সুমুখে সে একদম লম্বা হয়ে পড়েছে। আর জেলার বাবুরও আর একটু হলে হয়ে যেত। তিনি কারখানায় ঢুকে পড়ে বেঞ্চির তলায় লুকিয়ে খুব প্রাণটা বাঁচিয়েছেন।"

প্রায় পনের মিনিট পরে জেলের পাগলা ঘণ্টা (alarm bell) বাজিয়া উঠিল। চারিদিক হইতে জেলের প্রহরীরা ছুটিয়া আসিয়া হাসপাতালের দিকে চলিল। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম তাহারা কানাই ও সত্যেনকে ধরিয়া ৪৪ ডিগ্রীর দিকে লইয়া চলিয়াছে।

সপ্তম-পরিচ্ছেদ

নানারূপ গুজবের মধ্য হইতে সার সঙ্কলন করিয়া এই ঘটনা সম্বন্ধে যাহা বুঝিলাম তাহা এই :—হাসপাতালে থাকিবার সময় সত্যেনের মনে হয় যে, যখন কাশরোগে ভুগিতেছি তখন ত অল্পদিনের মধ্যে মরিতেই হইবে ; বৃথা না মরিয়া নরেনকে মারিয়া মরিলেই ত বেশ হয়। কানাইলাল সে কথা শুনিয়া তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য পিস্তল লইয়া হাসপাতালে আসে। পেটের যন্ত্রণা শুধু ডাক্তারকে ঠকাইবার জন্য ভাণ মাত্র। তাহার পর সত্যেন নরেনকে বলিয়া পাঠায় যে, জেলের কষ্ট আর তাহার সহ্য হইতেছে না ; সেও নরেনের মত সরকারী সাক্ষী হইতে চায় ; সুতরাং পুলিসের কাছে কি কি বলিতে হইবে তাহা যদি দুইজনে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ঠিক করে তাহা হইলে আদালতে জেরার সময় কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। সত্যেনের ছলনায় ভুলিয়া নরেন তাহাই বিশ্বাস করিল এবং একজন ইউরোপীয় প্রহরী সঙ্গে লইয়া সত্যেনের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। কথা কহিতে কহিতে যখন সত্যেন পিস্তল বাহির করিয়া তাহার উরু লক্ষ্য করিয়া গুলি করে তখন নরেন ঘর হইতে পলাইয়া যায়।

পলাইবার সময় তাহার পায়ে একটা গুলি লাগিয়াছিল, কিন্তু আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই। গুলির শব্দ শুনিবামাত্র কানাইলাল হাসপাতালে নীচে হইতে উপরে ছুটিয়া আসে। ইউরোপীয় প্রহরী তাহাকে ধরিতে যায়, কিন্তু হাতে একটা গুলি খাইয়া সে সেইখানেই পড়িয়া চীৎকার করিতে থাকে। ইতিমধ্যে নরেন নীচে আসিয়া হাসপাতালের বাহির হইয়া পড়ে। ইউরোপীয় প্রহরীকে ধরাশায়ী করিয়া কানাই যখন নরেনকে খুঁজিতে থাকে তখন সে হাসপাতালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং হাসপাতালের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া একজন প্রহরী সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। কানাই তাহার বুকের কাছে পিস্তল ধরিয়া ভয় দেখায় যে নরেন কোথায় পলাইয়াছে তাহা যদি সে বলিয়া না দেয় ত তাহাকে গুলি খাইয়া মরিতে হইবে। বেচারা দরজা খুলিয়া দিয়া বলে যে নরেন অফিসের দিকে গিয়াছে। কানাই ছুটিয়া আসিতে আসিতে দূর হইতে নরেনকে দেখিতে পায় ও গুলি চালাইতে থাকে। গুলির শব্দ শুনিয়া জেলার, ডেপুটী জেলার, অ্যাসিষ্টাণ্ট জেলার, বড় জমাদার, ছোট জমাদার সবাই সদলবলে হাসপাতালের দিকে আসিতেছিলেন। পথের মাঝে কানাই এর রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা রণে ভঙ্গ দেওয়াই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। কে যে কোথায় পলাইলেন, তাহার ঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না; তবে জেলার বাবু যে তাঁহার বিপুল কলেবরের অর্দ্ধেকটা কারখানার একটা বেঞ্চের নীচে ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। এদিকে কানাইএর হাত হইতে গুলি খাইতে খাইতে নরেন কারখানার দরজার কাছে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। কানাইয়ের গুলি যখন ফুরাইয়া গেল তখন বন্দুক, কীরিচ লাঠি সোটা লইয়া সকলেই বাহির হইয়া আসিল এবং কানাইকে ঘিরিয়া ফেলিল।

এখন প্রশ্ন এই, পিস্তল আসিল কোথা হইতে? কয়েদীরা গুজব রটাইল যে, বাহির হইতে আমাদের জন্য যে সমস্ত ঘিয়ের টিন বা কাঁঠাল আসিত তাহার মধ্যে ভরিয়া কেহ পিস্তল পাঠাইয়া থাকিবে। কানাইলাল বলিল, ক্ষুদিরামের ভূত আসিয়া তাহাকে পিস্তল দিয়া গিয়াছে। প্রেততত্ত্ববিদ্‌দের এক আধখানা বই পড়িয়াছি, কিন্তু ভূতকে পিস্তল দিয়া যাইতে কোথাও দেখি নাই। আর আমাদের স্বদেশী ভূতেরা গৃহস্থের বাড়ীতে ইট-পাটকেল ফেলে; খুব জোর কচুপাতায় মুড়িয়া এক আধটা খারাপ জিনিষ ছুঁড়িয়া মারে; সুতরাং পিস্তলের ব্যাপারে ভূতের থিওরিটা একেবারে অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই মনে হয়। কাঁঠাল বা ঘিয়ের টিনও ডাক্তার সাহেব নিজে পরীক্ষা করিয়া দিতেন, সুতরাং তাহার ভিতর দিয়া দুই দুইটা রিভলভার আসা তত সুবিধার কথা বলিয়া মনে হয় না। তবে কর্তৃপক্ষের চক্ষুর অগোচরে জেলের মধ্যে গাজা, গুলি, আফিম, সিগারেট সবই যে রাস্তা দিয়া যাইতে পারে, সে রাস্তা দিয়া পিস্তল যাওয়া ত বিচিত্র নয়!

যাক্ সে কথা। তাহা লইয়া এখন মাথা ঘামাইয়া কোন ফল আর নাই। কিন্তু নরেনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অদৃষ্ট পুড়িল: আধঘণ্টার মধ্যেই জেলের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সশস্ত্র সিপাহি শান্ত্রী লইয়া ব্যারাকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আর একে একে আমাদের সকলের তল্লাসী লইয়া বাহির করিয়া দিলেন। তাহার পর ব্যারাকের তল্লাসী আরম্ভ হইল। বিছানার মধ্যে বা এদিক ওদিক দশ বিশটা টাকা লুকান ছিল। তল্লাসীর সময় প্রহরীরা তাহা নির্ব্বিবাদে হজম করিয়া লইল। আমাদের কাছে ত কিছুই পাওয়া গেল না, কিন্তু ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় পুলিসের কর্ম্মচারীতে জেল ভরিয়া গেল। আরও রিভলভার জেলের মধ্যে লুকান

আছে কি না, পুকুরের মধ্যে দুই একটা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে কি না ইত্যাদি বহুবিধ গবেষণা চলিতে লাগিল। আমাদের বড় আশা হইয়াছিল যে, রিভলভার অনুসন্ধান করিবার জন্য যদি জেলখানার পুকুরের জল ছেঁচিয়া ফেলে, তাহা হইলে এক আধদিন যথেষ্ট পরিমাণে মাছ খাইতে পাওয়া যাইবে; কিন্তু অদৃষ্টে তাহা ঘটিল না। অধিকন্তু ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল আসিয়া আবার আমাদের পৃথক পৃথক কুঠরীর (cell) মধ্যে বন্ধ করিবার হুকুম দিয়া গেলেন। ডিগ্রী খালি করিয়া আমাদিগকে সেখানে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় জেলার বাবু আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। ভদ্রলোকের মুখ একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন—"মশায়, এতই যদি আপনাদের মনে ছিল, ত জেলের বাইরে কাজটা করলেই ত হতো। দেখছি ত আপনারা একেবারে মরিয়া; তবে ধরা পড়তে গেলেন কেন?" আমরা সমস্বরে প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, এ কার্য্যের সহিত আমাদের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। তিনি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে হাঁ, তা বুঝতেই পারচি। যাই হোক, আপনাদের যা হবার তা হবে; এখন আমার দফা রফা হয়ে গেল!"

এক সপ্তাহের মধ্যেই ৪৪ ডিগ্রী হইতে সমস্ত কয়েদী অন্যান্য জেলে চালান করিয়া আমাদের সেখানে স্থানান্তরিত করা হইল। জেল যে কাহাকে বলে এতদিনে তাহা বুঝিলাম।

পুরাতন সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের উপর নরেন্দ্রের হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধানের ভার পড়িল; তাঁহার জায়গায় নূতন সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আসিয়া কাজ করিতে লাগিলেন। পুরাতন জেলার ও ডাক্তার বদলি হইয়া গেলেন। আমাদের হাঁসপাতাল যাওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া

গেল। অসুখ হইলে কুঠরীর মধ্যে পড়িয়া থাকিতে হইত। কাহারও সহিত আর কাহারও কথা কহিবার উপায় রহিল না। সমস্ত দিন কুঠরীর মধ্যে খাও দাও, আর চুপ করিয়া বসিয়া থাক। জেলের অন্যান্য অংশ হইতেও কোন লোক ৪৪ ডিগ্রীতে ঢুকিতে পাইত না।

ক্রমে দেশী প্রহরীর পরিবর্ত্তে ইউরোপীয় প্রহরী আসিল, আর দিনের বেলা ও রাত্রি কালে দুইদল গোরা সৈন্য আসিয়া জেলের ভিতরে ও বাহিরে পাহারা দিতে আরম্ভ করিল। কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ হইয়াছিল যে, আমরা বোধ হয় জেল হইতে পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করিব।

প্রথম দুইটী কুঠরীতে কানাই ও সত্যেন আবদ্ধ থাকিত। আমরা পাঁচ সাত দিন অন্তর এক কুঠরী হইতে অন্য কুঠরীতে বদলী হইতাম। যখন কানাই বা সত্যেনের কাছাকাছি কোন কুঠরীতে আসিতাম তখন রাত্রিকালে চুপি চুপি তাহাদের সহিত কথা কহিতে পারিতাম। দিনের বেলা কাহারও সহিত কথা কহিবার কোন উপায়ই ছিল না। প্রাতঃকালে ও বৈকালে আধঘণ্টা করিয়া উঠানের মধ্যে ঘুরিতে পাইতাম; কিন্তু সকলকেই পরস্পরের কাছ হইতে দূরে দূরে থাকিতে হইত। প্রহরীদের চক্ষু এড়াইয়া কথা কহিবার সুবিধা হইত না।

সমস্ত দিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকার যে কি যন্ত্রণা তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কাহারও বুঝিবার উপায় নাই। একদিন সুপারিন্টেন্ডেণ্ট সাহেবের নিকট হইতে পড়িবার জন্য বই চাহিলাম। তিনি দুঃখের সহিত জানাইলেন যে, গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত আমাদের সম্বন্ধে তিনি কিছুই করিতে পারেন না। নরেনের মৃত্যুর পর তাঁহার হাত হইতে সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

আমরা যখন বাহিরে ঘুরিতাম তখন কানাই ও সত্যেনের কুঠরীর

দরজা বন্ধ থাকিত। একদিন দেখিলাম কানাইলালের দরজা খোলা রহিয়াছে। আমরা সেদিকে যাইবার সময় প্রহরীও বাধা দিল না। পরে শুনিলাম যে, কানাইলালের ফাঁসির দিনও স্থির হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য প্রহরীরা দয়া করিয়া কানাইকে শেষ দেখিবার জন্য আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

যাহা দেখিলাম তাহা দেখিবার মত জিনিসই বটে! আজও সে ছবি মনের মধ্যে স্পষ্টই জাগিয়া রহিয়াছে; জীবনের বাকি কয়টা দিনও থাকিবে। জীবনে অনেক সাধুসন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কানাইএর মত অমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড় একটা নাই। সে মুখে চিন্তার রেখা নাই, বিষাদের ছায়া নাই, চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই— প্রফুল্ল কমলের মত তাহা যেন আপনার আনন্দে আপনি ফুটিয়া রহিয়াছে। চিত্রকূটে ঘুরিবার সময় এক সাধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে,জীবন ও মৃত্যু যাহার কাছে তুল্যমূল্য হইয়া গিয়াছে সেই পরমহংস। কানাইকে দেখিয়া সেই কথা মনে পড়িয়া গেল। জগতে যাহা সনাতন, যাহা সত্য, তাহাই যেন কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে আসিয়া তাহার কাছে ধরা দিয়াছে। আর এই জেল, প্রহরী, ফাঁসীকাঠ, সবটাই মিথ্যা, সবটাই স্বপ্ন! প্রহরীর নিকট শুনিলাম ফাঁসির আদেশ শুনিবার পর তাহার ওজন ১৬' পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে! ঘুরিয়া ফিরিয়া, শুধু এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, চিত্তবৃত্তিনিরোধের এমন পথও আছে যাহা পতঞ্জলিও বাহির করিয়া যান নাই। ভগবান্‌ও অনন্ত, আর মানুষের মধ্যে তাঁহার লীলাও অনন্ত!

তাহার পর একদিন প্রভাতে কানাইলালের ফাঁসি হইয়া গেল। ইংরাজশাসিত ভারতে তাহার স্থান হইল না। না হইবারই কথা! কিন্তু ফাঁসির সময় তাহার নির্ভীক, প্রশান্ত ও হাস্যময় মুখশ্রী দেখিয়া

জেলের কর্ত্তৃপক্ষরা বেশ একটু ভ্যাবাচাকা হইয়া গেলেন। একজন ইউরোপীয় প্রহরী আসিয়া চুপি চুপি বারীনকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমাদের হাতে এ রকম ছেলে আর কতগুলি আছে?" যে উন্মত্ত জনসঙ্ঘ কালীঘাটের শ্মশানে কানাইলালের চিতার উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে ছুটিয়া আসিল, তাহারাই প্রমাণ করিয়া দিল যে, কানাইলাল মরিয়াও মরে নাই।

কিছুদিন কুঠরীতে বদ্ধ থাকিবার পরে আলিপুরের জজের আদালতে আমাদের মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল। দিনের মধ্যে ঘণ্টা কয়েকের জন্য একটু খোলা হাওয়া খাইয়া ও লোকজনের মুখ দেখিয়া আমাদের প্রাণগুলা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। দুই একজন ভিন্ন মোকর্দ্দমার খরচ জোগাইবার পয়সা কাহারও নাই; সুতরাং অরবিন্দ বাবুর সাহায্যের জন্য যে চাঁদা উঠিয়াছিল তাহা হইতেই উকিল-ব্যারিষ্টারদের অল্পস্বল্প খরচ দেওয়া হইতে লাগিল। যাঁহাদের অল্প দক্ষিণায় পোষাইল না তাঁহারা দুই চারিদিন পরেই সরিয়া পড়িলেন; শেষে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ অর্থের মায়া ত্যাগ করিয়া আমাদের মোকর্দ্দমা চালাইতে লাগিলেন।

হাইকোর্ট ছাড়িয়া আলিপুরে মোকর্দ্দমা চালাইতে আসায় ব্যারিষ্টারদের অনেক অসুবিধা; সুতরাং মোকর্দ্দমা যাহাতে হাইকোর্টে যায়, সে জন্য তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ হাইকোর্টে গেলে বিচারের ভার জুরির উপর পড়িত। বারীন্দ্রের বিলাতে জন্ম; সে একজন পুরাদস্তুর European British-born subject, সুতরাং সে ইচ্ছা করিলে মোকর্দ্দমা হাইকোর্টে লইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে বিলাতী সাহেবের অধিকার চায় কি না, তখন সে একেবারে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছিল—

না! কাজে কাজেই আলিপুরের জজের কাছে আমাদের বিচার আরম্ভ হইল।

কিন্তু বিচারের কে খবর রাখে, আমরা হট্টগোল লইয়াই ব্যস্ত। আদালত খোলার আরও একটা মহাসুবিধা এই যে, দুপুর বেলা জলখাবার পাওয়া যায়! জেলের ডাল-ভাত খাইয়া খাইয়া প্রাণপুরুষ যেরূপ মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে অনন্তকাল যদি এই মোকর্দ্দমা চলিত, তবুও জলখাবারটুকুর খাতিরে তিনি ঐ ব্যবস্থায় রাজী হইয়া পড়িতেন।

কোর্টে আসিবার ও যাইবার সময় আমাদের হাতকড়ার ভিতর দিয়া শিকল বাঁধা থাকিত। দুপুর বেলা শৌচ প্রস্রাব ত্যাগ করিতে গেলে সেই হাতকড়া পরান অবস্থায় পুলিশ আমাদের রাস্তা দিয়া টানিয়া লইয়া যাইত। আমাদের জন্য ততটা ভাবনা ছিল না; কেন না "ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়।" যাহার মান নাই তাহার আবার মানহানি কি? কিন্তু অরবিন্দ বাবুকে হাতকড়া পরাইয়া টানিয়া লইয়া যাইতে দেখিলে মনটার ভিতর একটা বিদ্রোহ জমাট হইয়া উঠিত। তিনি কিন্তু নিতান্ত নির্ব্বিরোধ ভদ্রলোকের মত সমস্তই নীরব হইয়া সহ্য করিতেন।

সাক্ষীরা একে একে আসিয়া আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া যাইত; আমাদের মনে হইত যেন থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছি। উকিল, ব্যারিষ্টারের জেরা; পুলিশ-কর্ম্মচারীদের ছুটাছুটি – সবই যেন একটা বিরাট তামাসা! আমাদের হাস্য-কোলাহলে মাঝে মাঝে আদালতের কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইত। জজ সাহেব আমাদের হাতকড়া লাগাইবার ভয় দেখাইতেন, ব্যারিষ্টারেরা ছুটিয়া আসিয়া অরবিন্দবাবুকে অনুরোধ করিতেন "ছেলেদের একটু থামতে বলুন।" অরবিন্দবাবু

নির্ব্বিকার প্রস্তর মূর্ত্তির মত এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন; ব্যারিষ্টারদের অনুরোধের উত্তরে জানাইতেন যে, ছেলেদের উপর তাঁহার কোনও হাত নাই।

বিচারসংক্রান্ত সব স্মৃতিটাই প্রায় ছায়ার মত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—শুধু মনে আছে, ইন্সপেক্টর শ্যামশূল আলমের কথা। আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী-সাবুদ জোগাড় করিবার ভার তাঁহার উপরই ছিল। মিষ্ট কথায় কিরূপে কাজ গোছাইতে হয়, তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন; তাই ছেলেরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গান গাহিত—"ওগো, সরকারের শ্যাম তুমি, আমাদের শূল। তোমার ভিটেয় কবে চরবে ঘুঘু, তুমি দেখবে চোখে সরূসে ফুল!" আমাদের মোকর্দ্দমা শেষ হইবার পর সরকার বাহাদুর তাঁহার যথেষ্ট পদোন্নতি করিয়া দেন, কিন্তু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে তাঁহাকে সে পদ-গৌরব অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই।

কোর্ট ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত আবদর রহমন সাহেবের কথাও মনে পড়ে, কেননা আমাদের জলখাবার জোগাইবার ভার তাঁহারই উপর ছিল। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মত তিনিই ছিলেন পুলিস কর্ম্মচারীদের মধ্যে এক মাত্র ভদ্রলোক। আমাদের সম্ভবতঃ দ্বীপান্তরে যাইতে হইবে, এই কথা ভাবিয়া তাঁহার মুখে যে করুণার ছবি ফুটিয়া উঠিত তাহা আজও বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে।

কিন্তু এ সমস্ত বাহিরের কথা আমাদের খুব বেশী আন্দোলিত করিত না। আমাদের মধ্যে তখন অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাহাই তখন আমাদের কাছে মোকর্দ্দমার দৈনন্দিন ঘটনা অপেক্ষা ঢের বেশী সত্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শুধু কাজ লইয়া যাহাদের একতার বাঁধন, কাজ ফুরাইলেই তাহাদের একতাও ফুরাইয়া আসে। ধরা পড়িবার পর আমাদের কতকটা সেই দশা ঘটিয়াছিল। যাঁহারা বিপ্লবপন্থী তাঁহারা সকলেই এক ভাবের ভাবুক নহেন। দেশের পরাধীনতা দূর হওয়া সকলেরই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু স্বাধীন হইবার পর দেশকে কিরূপ ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ ছিল। তাহার পর আমরা যে ধরা পড়িলাম, তাহা কতটা আমাদের নিজেদের দোষে, আর কতটা ঘটনাচক্রের দোষে —তাহা লইয়াও আমাদের মধ্যে তীব্র সমালোচনা চলিত! বাহিরে কাজকর্ম্মের তাড়ায় যে সমস্ত ভেদ চাপা পড়িয়া থাকিত, ধরা পড়িবার পর তাহা ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

একদল শুধু ধর্ম্মচর্চ্চা লইয়াই থাকিতেন; আর যাঁহারা রাজনীতির উপাসক তাহারা ঐ দলকে ঠাট্টা করিয়া দিন কাটাইতেন। ঐ সময় আমাদের মধ্যে হেমচন্দ্র "ভক্তিতত্ত্ব কুজ্ঝটিকা" কথাটার সৃষ্টি করেন। হেমচন্দ্রের বিশ্বাস যে ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিলে মানুষের বুদ্ধি ঘোলাটে হইয়া যায়, আর সে কাজের বাহির হইয়া পড়ে। ডকের মধ্যে বসিয়া উভয় দলেরই বিচার কার্য্য চলিত। দেবব্রত ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন; হেমচন্দ্র ধার্ম্মিকদিগের নামে ছড়া ও গান বাঁধিতেন। বারীন্দ্র এককোণে দু'একটি অনুচর লইয়া কখনও বা ধর্ম্মালোচনা করিত কখনও বা চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত। আমি উভয় দলেরই রসাস্বাদন করিয়া ফিরিতাম।

এই হট্টগোল ও দলাদলির মধ্যে একেবারে নিশ্চল স্থাণুর মত বসিয়া

থাকিতেন—অরবিন্দ বাবু। কোন কথাতেই হাঁ, না, কিছুই বলিতেন না। জেলের প্রহরীদের নিকট হইতে তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাইতাম। কেহ বলিত তিনি রাত্রে নিদ্রা যান না, কেহ বলিত তিনি পাগল হইয়া গিয়াছেন! ভাত খাইবার সময় আরসুলা টিকটিকি ও পিঁপড়াদের ভাত খাইতে দেন; স্নান করেন না, মুখ ধোন না, কাপড় ছাড়েন না—ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যাপারটা জানিবার জন্য বড় কৌতূহল হইত; কিন্তু তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস কুলাইত না। মাথায় মাখিবার জন্য আমরা কেহই তেল পাইতাম না; কিন্তু দেখিতাম যে অরবিন্দ বাবুর চুল যেন তেলে চক্‌চক্‌ করিতেছে। একদিন সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি স্নান করবার সময় মাথায় তেল দেন?" অরবিন্দ বাবুর উত্তর শুনিয়া চমকিয়া গেলাম। তিনি বলিলেন—"আমি ত স্নান করি না।" জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার চুল তবে অত চক্‌চক্‌ হয় কি করে?" অরবিন্দ বাবু বলিলেন—"সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে কতকগুলা পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে। আমার শরীর থেকে চুল বসা (fat) টেনে নেয়।"

দুই একজন সন্ন্যাসীর ওরূপ হইতে দেখিয়াছি; কিন্তু ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝি নাই। তাহার পর ডকের মধ্যে একদিন বসিয়া থাকিতে থাকিতে লক্ষ্য করিলাম যে অরবিন্দবাবুর চক্ষু যেন কাচের চক্ষুর মত স্থির হইয়া আছে; তাহাতে পলক বা চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই। কোথায় পড়িয়াছিলাম যে চিত্তের বৃত্তি একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া গেলে চক্ষে ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। দুই একজনকে তাহা দেখাইলাম; কিন্তু কেহই অরবিন্দ বাবুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। শেষে শচীন আস্তে আস্তে তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি সাধন করে কি পেলেন?' অরবিন্দ সেই ছোট ছেলেটীর কাঁধের

উপর হাত রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"যা খুঁজছিলাম, তাই পেয়েছি।"

তখন আমাদের সাহস হইল, আমরা তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া বসিলাম। অন্তর্জগতের যে অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিলাম তাহা যে বড় বেশী বুঝিলাম তাহা নহে : তবে এই ধারণাটী হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, এই অদ্ভুত মানুষটীর জীবনে একটা সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। জেলের মধ্যে বৈদান্তিক সাধনা শেষ করিয়া তিনি যে সমস্ত তান্ত্রিক সাধনা করিয়াছিলেন তাহারও কতক কতক বিবরণ শুনিলাম। জেলের বাহিরে বা ভিতরে তাঁহাকে তন্ত্রশাস্ত্র লইয়া কখনও আলোচনা করিতে দেখি নাই। এ সমস্ত গুহ্য সাধনের কথা তিনি কোথায় পাইলেন জিজ্ঞাসা করায় অরবিন্দ বাবু বলিলেন যে, একজন মহাপুরুষ সূক্ষ্মশরীরে আসিয়া তাঁহাকে এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়া যান। মোকর্দ্দমার ফলাফলের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"আমি ছাড়া পাব।"

ফলে তাহাই হইল। মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইবার এক বৎসর পরে যখন রায় বাহির হইল তখন দেখা গেল সত্যসত্যই অরবিন্দ বাবু মুক্তি পাইয়াছেন! উল্লাসকর ও বারীন্দ্রের ফাঁসির, আর দশজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হইল। বাকি অনেকের পাঁচ সাত দশ বৎসর করিয়া জেল বা দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইল। ফাঁসির হুকুম শুনিয়া উল্লাসকর হাসিতে হাসিতে জেলে ফিরিয়া আসিল ; বলিল,—"দায় থেকে বাঁচা গেল। একজন ইউরোপীয় প্রহরী তাহা দেখিয়া তাঁহার এক বন্ধুকে ডাকিয়া বলিলেন—**Look look, the man is going to be hanged and he laughs!** (দেখ, লোকটার ফাঁসি হইবে তবু সে হাসিতেছে)। তাঁহার বন্ধুটী আইরিশ; তিনি

বলিলেন—"Yes, I know ; they all laugh at death" (হাঁ, আমি জানি ; মৃত্যু তাহাদের কাছে পরিহাসের জিনিস।)

১৯০৯ এর মে মাসে রায় বাহির হইল। আমরা পনের ষোল জন মাত্র বাকি রহিলাম ; বাকি সবাই হাসিতে হাসিতে বাহিরে চলিয়া গেল। আমরাও হাসিতে হাসিতে তাহাদের বিদায় দিলাম ; কিন্তু সে হাসির তলায় তলায় একটা যেন বুকফাটা কান্না জমাট হইয়া উঠিতেছিল। জীবনটা যেন হঠাৎ অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়িল। পণ্ডিত হৃষীকেশ মূর্ত্তিমান বেদান্তের মত বলিয়া উঠিলেন—"আরে কিছু নয়, এ একটা দুঃস্বপ্ন।" হেমচন্দ্র বুকে সাহস বাঁধিয়া বলিলেন—"কুচ পরোয়া নেহি, এ ভি গুজর যায়েগা" (কোন ভয় নেই, এদিনও কেটে যাবে) বারীন্দ্র ফাঁসির হুকুম শুনিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"সেজদা (অরবিন্দ) বলে দিয়েছে ফাঁসী আমার হবে না।" আমিও সকলকার দেখাদেখি হাসিলাম ; কিন্তু বীরের মন যে ধাতু দিয়া গঠিত হয়, আমার মন যে সে ধাতু দিয়া গঠিত নয় তাহা এইবার বেশ ভাল করিয়াই দেখিতে পাইলাম। মনটা যেন নিতান্ত অসহায় বালকের মত দিশেহারা হইয়া উঠিল। বাকি জীবনটা জেলখানাতেই কাটাইয়া দিতে হইবে ! উঃ ! এর চেয়ে যে ফাঁসী ছিল ভাল। ভগবানের দোহাই দিয়া যে নির্ব্বিবাদে দুঃখকষ্ট হজম করিব সে উপায়ও আমার ছিল না। ভগবানের উপর বিশ্বাসটা অনেক দিন হইতেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ছেলেবেলা একবার বৈরাগ্যের ঝুলি কাঁধে লইয়া সাধু সাজিতে বাহির হইয়াছিলাম। তখন ভগবানের উপরে ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব বেশ একটা ছিল। মায়াবতীর মাঠে স্বামী স্বরূপানন্দের নিকট নির্গুণ ব্রহ্মবাদে দীক্ষিত হইবার পর ধীরে ধীরে সে ভক্তি ও বিশ্বাস কোথায় উড়িয়া গেল ! স্বামীজী বিদ্রূপ ও যুক্তিতর্কের তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ করিয়া যেদিন আমার ভগবানটিকে

নিহত করেন সে দিনের কথা আমার এখনও বেশ মনে পড়ে। এই বিশাল মায়া-সমুদ্রের মাঝখানে একাকী ডুব সাঁতার কাটিতে কাটিতে সম্পূর্ণ হিমাঙ্গ হইয়া ওপারে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে উঠিতে হইবে ভাবিয়া আমার রক্ত একেবারে শীতল হইয়া গিয়াছিল! নির্ব্বিকল্প সমাধির মধ্যে ডুব দিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকার ন্যমই মুক্তি—এ তত্ত্ব আমার মাথার মধ্যে বেশী দিন রহিল না। চরম তত্ত্ব বলিয়া একটা কিছু মানুষ আপনার মধ্যে পাইয়াছে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হইল। মনে হইতে লাগিল নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে আরম্ভ করিয়া জাগ্রত অবস্থা পর্য্যন্ত সব অবস্থাগুলাই অনন্তের এক একটা দিক মাত্র; এ দুই অবস্থার উপরে ও নীচে এরূপ অনন্ত অবস্থা পড়িয়া আছে। সেই অনন্তের মধ্যে এমন একটা কিছু সত্য আছে যাহা মানুষের জীবনে কর্ম্মরূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং জীবনকে ছাড়িয়া পলাইতে যাইব কেন? সমাধির চেয়ে কর্ম্ম কিসে ছোট?

কর্ম্মকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য করিয়া স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত লেলে আসিয়া যখন আমাদের মধ্যে ভক্তিমূলক সাধনা প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করেন তখন মহাবিজ্ঞের ন্যায় তাঁহার ভক্তিবাদকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম। সবটাই যখন সেই অনন্তের মূর্ত্তি, তখন ভগবানের যে রূপ জগতে মূর্ত্ত তাহা ছাড়িয়া অন্য রূপ ধ্যান করিবার সার্থকতা কি? লেলে তখন শুধু এই কথাটী বলিয়াছিলেন—"যাহা বলিতেছ তাহা যদি বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে আর আমার বুঝাইবার কিছু নাই; কিন্তু অদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈতেরও স্থান আছে, এ কথা ভুলিও না।"

আজ যখন বিধাতা জোর করিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া দিলেন, তখন নিজের মধ্যে কোন অবলম্বনই খুঁজিয়া পাইলাম না।

একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব আশ্রয় পাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলাম; প্রাণটা কাতর হইয়া বলিতে লাগিল—"রক্ষা কর, রক্ষা কর"।

বিপদে পড়িলে আর কিছু লাভ না হোক, মানুষ নিজেকে চিনিবার অবসর পায়। কঠোর নিষ্পেষণের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে তাহাই আরম্ভ হইল। সেসন্স কোর্টের রায় বাহির হইবার পর হইতেই আমাদের পায়ে বেড়ী লাগাইয়া কুঠরীর মধ্যে ফেলিয়া রাখা হইল। সমস্ত দিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সময় এক একবার মনে হইত যেন পাগল হইয়া গেলাম। মাথার ভিতর উন্মত্ত চিন্তার তরঙ্গ যেন মাথা ফাটাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে। সমস্ত দিন কাহারও সহিত কথা কহিবার জো নাই।

একদিন সন্ধ্যার সময় এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া আছি এমন সময় পার্শের কুঠরীতে একটী ছেলে চীৎকার করিয়া গান গাহিয়া উঠিল। তাল মান লয়ের সহিত সে গানের বড় একটা সম্বন্ধ নাই; কিন্তু সে গান শুনিয়া খুব এক চোট হো হো করিয়া হাসিয়া আর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া যে আমার প্রচণ্ড মাথাধরা ছাড়িয়া গিয়াছিল তাহা বেশ মনে পড়ে। গান শুনিয়া চারিদিক হইতে ইউরোপীয় প্রহরীরা ছুটিয়া আসিল; এবং পরদিন সুপারিন্‌টেনডেণ্ট সাহেবের বিচারে বেচারার চারিদিন চালগুঁড়া সিদ্ধ (penal diet) খাইবার ব্যবস্থা হইল।

আর একটী ছেলে একদিন দেওয়াল হইতে চুণ খসাইয়া দরজার গায়ে লিখিয়া রাখিল—Long live Kanailal!" তাহারও চারিদিন সাজা হইল।

প্রহরীদের মধ্যে সকলেই আমাদের জব্দ করিবার চেষ্টায় ফিরিত। কিন্তু দু একজন বেশ ভালমানুষও ছিল। আমাদের মধ্যে যাহারা সাজা পাইত তাহাদের জন্য একজন ইউরোপীয় প্রহরীকে পকেটে করিয়া

কলা লুকাইয়া আনিতে দেখিয়াছি। চুপি চুপি কলা খাওয়াইয়া বেচারা পকেটে পুরিয়া খোসাগুলি বাহিরে লইয়া যাইত।

একজন লম্বা চওড়া হাইলাণ্ডার প্রহরী মাঝে মাঝে আমাদের জ্বালাতন করিয়া আপনার প্রহরীজন্ম সার্থক করিত। আমরা তাহার নাম দিয়াছিলাম "Ruffian warder"; মাঝে মাঝে সে আমাদের বক্তৃতা দিয়া বুঝাইয়া দিত যে, সে ও তাহার স্বজাতিরা ভারতবর্ষকে সভ্য করিবার জন্য এখানে আসিয়াছে। কিন্তু সকলের চেয়ে মিষ্টমুখ সয়তান ছিল চিফ্ ওয়ার্ডার স্বয়ং। সে আবার মাঝে মাঝে ধর্ম্মের তত্ত্বকথাও আমাদের শুনাইত; এবং আশা দিত যে, জীবনের বাকি কয়টা দিন সৎ হইয়া চলিলে স্বর্গে গিয়া আমরা ইংরাজের মত ব্যবহারও পাইতে পারি। হায়রে ইংরাজের স্বর্গ! জেলখানার মধ্যে গালাগালি, মারামারি সবই সহ্য হয়; কিন্তু ইহাদের মুখে ধর্ম্মের বক্তৃতা সহ্য করা দায়!

আমাদের মধ্যে হেমচন্দ্র চিত্র-বিদ্যায় বেশ নিপুণ। তিনি দেওয়ালের শ্যাওলা, চুণ ইটের গুড়া ঘসিয়া নানারূপ রং প্রস্তুত করিয়া সুন্দর সুন্দর ছবি দেওয়ালের গায়ে আঁকিয়া রাখিতেন! প্রহরীদের অত্যাচার হইতে বাঁচিবার জন্য মাঝে মাঝে কাগজের উপর নখ দিয়া নানারূপ ছবিও তাহাদিগকে আঁকিয়া দিতেন।

যাঁহারা চিত্রবিদ্যায় নিপুণ নন, তাঁহারা মাঝে মাঝে দেওয়ালের গায়ে কবিতা লিখিয়া মনের খেদ মিটাইতেন। একদিন এক কুঠরীর মধ্যে গিয়া দেখিলাম, একজন অজ্ঞাতনামা কবি দেওয়ালের গায়ে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন—

ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে পাট শরীর হইল কাঠ
সোনার বরণ হৈল কালি।

প্রহরী যতেক বেটা বুদ্ধিতে বোকা পাঁটা
দিন রাত দেয় গালাগালি ॥

আমাদের সে সময় কাজ ছিল পাট-ছেঁড়া।

মাঝে মাঝে এক আধটী বেশ ভাল কবিতাও নজরে পড়িত। আমার মনের ফাঁদে কবিতা প্রায় ধরা পড়ে না; কিন্তু এই দুইছত্র কিরূপে আটকাইয়া গিয়াছিল—

"রাধার দুটী রাঙ্গা পায়
অনন্ত পড়েছে ধরা—
উঠে ভাসে কত বিশ্ব
চিদানন্দে মাতোয়ারা।"

হায়রে মানুষের প্রাণ! জেলের কুঠরীর মধ্যে বদ্ধ থাকিয়াও রাধার দুটী রাঙ্গা পায় আছাড় খাইয়া পড়িতেছে!

সেসন্স কোর্টে রায় বাহির হইবার পর হইতেই হাইকোর্টে আমাদের আপিলের শুনানি চলিতেছিল। নভেম্বর মাসে রায় বাহির হইল। উল্লাসকর ও বারীন্দ্রের ফাঁসির হুকুম বন্ধ হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের হুকুম হইল। অনেকের কারাদণ্ড কমিয়া গেল, কেবল হেমচন্দ্রের ও আমার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড পূর্ব্ববৎই রহিয়া গেল।

পাছে দড়ি পাকাইয়া ফাঁসি খাই সেই ভয়ে আমাদের পাট ছিঁড়িতে দেওয়া বন্ধ হইয়া গেল।

অল্পদিনের মধ্যেই যাহারা দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত, তাহারা ভিন্ন অপর সকলকে ভিন্ন ভিন্ন জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। আমরা আন্দামানের জাহাজের প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ

হাইকোর্টের রায় বাহির হইবার পর হইতেই পুলিসের আনাগোনা একটু ঘন ঘন আরম্ভ হইয়াছিল—সাজা কমাইবার প্রলোভনে যদি কেহ কোন নূতন কথা বলিয়া দেয়! আমাদের ধরা পড়িবার পরই নানা কারণে এতকথা বাহির হইয়া গিয়াছিল যে, পুলিসের জানিবার আর বোধ হয় বেশী কিছু বাকী ছিল না! কিন্তু তথাপি পুলিস একবার নাড়া চাড়া দিয়া দেখিল আর কিছু সংগ্রহ করা যায় কিনা। নির্জ্জন কারা-বাসের সময় মানুষের মন অপরের সঙ্গে কথা কহিবার জন্য যেরূপ অস্থির হইয়া উঠে, পুলিসেরা তাহা বেশ ভাল করিয়াই জানে। দুই এক মাস যদি কাহারও সহিত কথা কহিতে না পাওয়া যায় তাহা হইলে মানুষের টিকটিকি, আরসুলার সহিতই কথা কহিতে ইচ্ছা হয়—পুলিস ত তবু মানুষ! কতকগুলা বাজে কথা কহিতে গেলে তাহার সহিত দুই একটা গোপনীয় কথাও বাহির হইবার সম্ভাবনা। বিশ ত্রিশ জন লোকের নিকট ঘুরিলে অন্ততঃ চার পাঁচ জনের নিকট হইতে এরূপ এক আধটা কাজের কথা পাওয়া যায়! পুলিসের তাহাই ভরসা।

কথা বাহির হইবার আরও একটা কারণ এই যে, নামে 'গুপ্তসমিতি' হইলেও কতকটা অভিজ্ঞতা ও কতকটা অর্থের অভাবে আমাদের কার্য্য-প্রণালী শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইউরোপীয় গুপ্তসমিতি-গুলির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন অধ্যক্ষের অধীনে থাকে; এবং এক বিভাগের লোক অন্য বিভাগের লোকের সহিত বিনা প্রয়োজনে পরিচিত হইবার অবসর পায় না। সমিতির অধ্যক্ষদের এই চেষ্টা থাকে যেন প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন কর্ম্ম ভিন্ন অপরের কর্ম্ম না জানিতে পারে।

এইরূপ নিয়ম থাকায় এক আধজনের দুর্ব্বলতায় সমস্ত কার্য্য নষ্ট হইতে পায় না। নানা কারণে সেরূপ ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে হইয়া উঠে নাই আর তাহার উপর আমাদের স্বভাবসিদ্ধ গল্প করিবার প্রবৃত্তি ত আছেই। আমাদের দেশে প্রত্যেক সমিতির ভিতর হইতে যে দুই একজন করিয়া সরকারী সাক্ষী বাহির হইয়াছিল কার্য্যপ্রণালীর শিথিলতাই তাহার প্রধান কারণ। দলাদলি ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের ফলেও অনেক সময় অনেক সমিতির গুপ্তকথা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। যে জাতি বহুদিন শক্তির আস্বাদন পায় নাই, তাহাদের নেতারা যে প্রথম প্রথম ক্ষমতালোলুপ হইয়া দাঁড়াইবে তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছুই নাই। আর নেতাদিগের মধ্যে অযথা প্রভুত্ব প্রকাশের ইচ্ছা থাকিলে অনুচরদিগের মধ্যে ঈর্ষ্যা ও অসন্তুষ্টি অনিবার্য্য।

একটা সুবিধার কথা এই যে গল্প করিবার প্রবৃত্তি শুধু আমাদের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। ইউরোপীয় প্রহরীরাও প্রায় সমস্ত দিন জেলের মধ্যে বন্ধ থাকিয়া হাঁপাইয়া উঠিত। তাহাদের মধ্যেও বেশ একটু দলাদলি ছিল। একদল অপর দলকে জব্দ করিবার জন্য মাঝে মাঝে আমাদেরও সাহায্যপ্রার্থী হইত; এবং তাহাদের কথাপ্রসঙ্গে জেলের অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশ পাইত।

কিছুদিন এইরূপ থাকিবার পর শুনিলাম যে, Civil Surgeon আমাদের আন্দামানে পাঠাইবার জন্য পরীক্ষা করিতে আসিবেন। যথা সময়ে Civil Surgeon আসিয়া পেট টিপিয়া, চোখ দেখিয়া সাতজনের ভবনদী পারের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। সুধীর ও আমি তখন রক্ত আমাশয়ে ভুগিতেছিলাম বলিয়া আমাদের আরও কিছুদিনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল।

সাধারণ কয়েদীর পক্ষে নিয়ম এই যে একবার রোগের জন্য আন্দামান

যাওয়া বন্ধ থাকিলে আরও তিন মাস অপেক্ষা করিতে হয়; কিন্তু আমাদের বেলা সে আইন খাটিল না। সরকার বাহাদুরের আদেশক্রমে আমাদের ছয় সপ্তাহের মধ্যেই পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

কারাগৃহ হইতে একবার দেশকে শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম। একদিন ভোরবেলা আমাদের হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া আমাদের একখানা গাড়ীতে চড়ান হইল। দুই পাশে দুইজন সার্জেণ্ট বসিল; আর গাড়ী খিদিরপুর ডকের দিকে ছুটিল।

জাহাজে উঠাইয়া দিয়া একজন সার্জ্জেণ্ট বিদ্রূপ করিয়া বলিল— **Now say, 'my native land, farewell,'** আমরা হাসিয়া বলিলাম, —"**An revoir!**" বলিলাম বটে, কিন্তু ফিরিবার আশাটা নিতান্তই জবরদস্তি মনে হইতে লাগিল।

রাজনৈতিক কয়েদী আমরা শুধু দুই জন মাত্র ছিলাম—সুধীর ও আমি। জাহাজের খোলের মধ্যে একটা কামরায় আমরা ছিলাম; অপর কামরায় অন্যান্য কয়েদী ছিল। জাহাজের একজন বাচ্ছা কর্ম্মচারী আসিয়া আমাদের ফটো তুলিয়া লইল। বিলাতের কোন্ কাগজে সে এই সমস্ত ফটো ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। কথাটা শুনিবামাত্র পাগুড়ীটা ভাল করিয়া বাঁধিয়া লইলাম। সস্তাদরে যদি একটা ছোট খাট বড়লোক হইয়া পড়া যায় ত মন্দ কি।

তিন দিন তিন রাত সেই জাহাজের খোলের মধ্যে চিড়া চিবাইতে চিবাইতে যাইতে হইবে দেখিয়া, সুধীর ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে একটা হাতীর মত জোয়ান—তিন মুঠো চিড়া চিবাইয়া তাহার কি হইবে? পুলিসের একজন পাঞ্জাবী মুসলমান হাওলদার বলিল—"বাবু, যদি আমাদের হাতের ভাত খাও, ত দিতে পারি।" মুসলমানদের মধ্যে সহানুভূতিও আছে, আর ভাত খাওয়াইয়া হিন্দুর জাত মারিবার

ইচ্ছাও একটু একটু আছে। আমরা বলিলাম—"খুব ভাল কথা। আমাদের জাত এত পাকা যে, যে কোন লোকের হাতের ভাত খাইলেও তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে না।" সেখানে শিখ হাওলদারও ছিল, তাহারা ভাবিল পেটের জ্বালায় আমরা পরকালটা একেবারে নষ্ট করিতে বসিয়াছি। তাই তাহারাও আমাদের ভাত দিতে চাহিল। আমরা নির্ব্বিবাদে উভয় দলের রান্না ভাত খাইয়া পেটের জ্বালাও থামাইলাম, ও আপনাদের উদারতাও প্রমাণ করিলাম। শিখেরা ভাবিল—"বাঙ্গালী বাবুরা বুদ্ধিমান বটে, কিন্তু উহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান একেবারে নাই।" যাই হোক, ধর্ম্ম বাঁচিল কি মরিল তাহা ঠিক জানি না, কিন্তু দুটী ভাত খাইয়া সে যাত্রা প্রাণটা বাঁচিয়া গেল। জাহাজে আমাদের নোয়াখালী জেলার অনেকগুলি বাঙ্গালী মুসলমান মাল্লাও ছিল, তাহাদের হাতে রান্না ভাত ও কুমড়ার ছক্কা যেন অমৃতোপম মনে হইল।

যাই হোক, কোনও রূপে তিন দিন জাহাজে কাটাইয়া চতুর্থ দিনে পোর্টব্লেয়ারে হাজির হইলাম। দূর হইতে জায়গাটী বড়ই রমণীয় মনে হইল। সারি সারি নারিকেল গাছ, আর তাহার মাঝে মাঝে সাহেবদের বাংলোগুলি যেন একখানি ফ্রেমে বাঁধান ছবির মত। ভিতরের কথা তখন কে জানিত?

দূরে একখানা প্রকাণ্ড ত্রিতল বাড়ী দেখাইয়া দিয়া একজন সিপাহী বলিল—"ঐ কালাপানীর জেল, ঐখানে তোমাদের থাকিতে হইবে।"

জাহাজ আসিয়া বন্দরে লাগিল। ডাক্তার আসিয়া সকলকে পরীক্ষা করিয়া গেল। তাহার পর ডাঙ্গায় নামিয়া আমরা বিছানা মাথায় করিয়া বেড়ী বাজাইতে বাজাইতে জেলের দিকে রওনা হইলাম।

জেলের মধ্যে ঢুকিবামাত্র একজন স্থূলকায় খর্ব্বাকৃতি শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আমাদের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—"So, here you

are, at last! Well, you see that block yonder. It is there that we tame lions. You will meet your friends there, but mind you don't talk"

(এই যে এসেছ ! ঐ দেখছো বাড়ীটা, ঐখানে আমরা সিংহদের পোষ মানাই। ওখানে তোমার বন্ধুদের দেখতে পাবে, কিন্তু খবরদার, কথা ক'য়ো না)।

আমরাও শ্বেতাঙ্গটিকে একবার চক্ষু দিয়া মাপিয়া লইলাম। লম্বায় পাঁচ ফুট, আর চওড়ায় প্রায় তিন ফুট। মোট কথা,একটা প্রকাণ্ড কোলা ব্যাঙকে কোট-পেণ্টুলান পরাইয়া মাথায় টুপি পরাইয়া দিলে যেরূপ দেখায় অনেকটা সেই রকম। তখন জানিতাম না ইনিই মহামহিম শ্রীমান্ ব্যারী, জেলার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। তাঁহার বুলডগের মত মুখখানি দেখিলে মনে হয় যে কয়েদী তাড়াইতে যাঁহাদের জন্ম, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। ভগবান নির্জ্জনে বসিয়া ইহাকে কালাপানির জেলে কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্যই গড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে Uncle Tom's Cabin এর লেগ্রিকে মনে পড়ে।

ভবিষ্যতে তাঁহার সহিত ভাল করিয়া পরিচিত হইবার অবসর পাইয়াছিলাম, কেননা প্রায় এগার বৎসর তাঁহার অধীনে এই জেলে বাস করিতে হইয়াছিল।

ইনি রোমান ক্যাথলিক আইরিশ। সারা বৎসর কয়েদী ঠেঙ্গাইয়া যে পাপের বোঝা তাঁহার ঘাড়ে চড়িত, তাহা যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে গির্জায় গিয়া পাদরী সাহেবের পদপ্রান্তে নামাইয়া দিয়া আসিতেন। বৎসরের মধ্যে ঐ একদিন তিনি শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি ধরিতেন; সে দিন কোন কয়েদীকে তাড়না করিতেন না; আর বাকি ৩৬৪ দিন মূর্ত্তিমান যমের মত কয়েদী তাড়াইয়া বেড়াইতেন।

কয়েদীদের স্বভাবের মধ্যে এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি যে, দুর্দ্দান্ত লোকদিগের প্রতি তাহারা সহজেই আকৃষ্ট হয়, এবং এইরূপ লোকদিগেরই সহজে বশ্যতা স্বীকার করে। ব্যারী সাহেবের নিকট প্রহার খাইবার পর অনেক কয়েদীকে বলিতে শুনিয়াছি—"শালা বড় মরদ হৈ।" যাহারা ভাল মানুষ তাহারা কয়েদীদের মতে স্ত্রী জাতীয়। কয়েদীরা কোন কুকার্য্য করিয়া ভগবানের নাম করিয়া ক্ষমা চাহিলে ব্যারী বলিতেন—"জেলখানা আমার রাজ্য; এটা ভগবানের এলাকাভুক্ত নহে। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া আমি পোর্টব্লেয়ারে আছি; একদিনও এখানে ভগবানকে আসিতে দেখি নাই।"—ব্যারী সাহেবের মুখের কথা হইলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য।

জেলে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই আমাদের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ তাহাদের পৈতা কাড়িয়া লওয়া হইল। দেশের জেলে ঐরূপ কোনও নিয়ম না থাকিলেও কালাপানিতে ঐ নিয়মই বলবৎ। জেল জগন্নাথক্ষেত্র এখানে জাতিভেদ মরিয়া প্রেতদশা লাভ করিয়াছে। তবে মুসলমানদের দাড়ি বা শিখের চুলে হাত দেওয়া হয় না; কিন্তু গোবেচারা ব্রাহ্মণের পৈতা কাড়িতে সবাই ক্ষিপ্রহস্ত। তাহার কারণ শিখ, মুসলমান গোঁয়ার কিন্তু ব্রাহ্মণ নিরীহ। যাই হোক, তেজহীন ব্রাহ্মণের নির্ব্বিষ খোলসখানাকে ত্যাগ করিয়া আমরা ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশিয়া গেলাম।

জেলে ঢুকিলে প্রথমেই নজরে পড়ে বহু জাতির সমাবেশ। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, বর্ম্মা, মাদ্রাজী সব মিশিয়া খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছে। হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান সমান; বর্ম্মীও যথেষ্ট। ভারতবর্ষে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় হিন্দুর এক চতুর্থাংশ কিন্তু জেলখানায় হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান কি করিয়া হইল তাহা স্থির করিতে গেলে উভয় জাতির একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে বলিয়া

মনে হয়। ব্রহ্মদেশে লোকসংখ্যা মোট এক কোটী; অর্থাৎ সমস্ত বাঙ্গালীর প্রায় চার ভাগের এক ভাগ; কিন্তু এখানে বাঙ্গালী অপেক্ষা ব্রহ্মদেশীয় লোকের সংখ্যা অনেক বেশী। খুন, মারামারি করিতে ব্রহ্মদেশীয় লোক বিশেষ মজবুদ! অল্পদিন মাত্র তাহারা স্বাধীনতা হারাইয়াছে সুতরাং ভারতবর্ষের লোকের মত একেবারে শিষ্ট শান্ত হইয়া যায় নাই। হিন্দুস্থান ব্যতীত অন্য দেশের উচ্চশ্রেণীর লোকের সংখ্যা খুব কম। শিক্ষা প্রচারের আধিক্যবশতঃই হোক বা প্রকৃতির নিরীহতাবশত,ই হোক মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ একেবারে নাই বলিলেই চলে। আমরা যে সময় উপস্থিত হইলাম তখন জেলখানার মধ্যে পাঠনের প্রাধান্য খুব বেশী। সব জাতিকে একত্র রাখার ফলে যে দুর্ব্বল জাতিদের উপর অযথা অত্যাচার যথেষ্ট হয় তাহা বলাই বাহুল্য।

দিনকত থাকিতে থাকিতেই দেখিলাম যে জেলখানায় দুর্ব্বলের পক্ষে সুবিচার পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-সাবুদ দিবার বুকে পাটা কয়েদীদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। পরের জন্য নিজের ঘাড়ে বিপদ কে টানিয়া আনিতে যাইবে? যে যার নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাইতেই ব্যস্ত। যাহারা খোসামোদ করিতে সিদ্ধহস্ত, মিথ্যা কথা যাহারা জলের মত বলিয়া যাইতে পারে তাহারাই কর্ত্তৃপক্ষের কাছে ভাল মানুষ এবং তাহারাই প্রভুদিগের প্রসাদ লাভে সমর্থ। আর যাহারা ন্যায় বিচারের প্রত্যাশা করিয়া অপরের জন্য লড়াই করিতে যায়, তাহাদের অদৃষ্টে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ঘটে! মিথ্যা মোকদ্দমার ফাঁদে পড়িয়া তাহারা অযথা খাইয়া মরে। ফলে জেলখানায় যত কয়েদী আসে, তাহার মধ্যে একজনও যে জেল খাটার ফলে সচ্চরিত্র হইয়া যায় তাহা মনে করিবার কারণ নাই।

বাস্তবিকই কয়েদীদের ভাল করিয়া তুলিবার চেষ্টা সেখানকার কর্ত্তৃ-

পক্ষদের মোটেই নাই বলিলে চলে। অসচ্চরিত্র লোকদিগকে সচ্চরিত্র করিয়া তোলাতেই যে জেলখানার সার্থকতা, সে ধারণাও তাঁহাদের আছে বলিয়া মনে হয় না। কয়েদী তাঁহাদের কাছে কাজ করিবার যন্ত্র বিশেষ, আর যে অফিসার কয়েদী ঠেঙ্গাইয়া যত বেশী কাজ আদায় করিতে পারে সে তত কাজের লোক; তাহার পদোন্নতি তত দ্রুত।

আর একটা মজার কথা এই যে, সে উল্টা রাজার দেশে মুড়ি মিছরী সব একদর—সব রকম অপরাধের জন্য দণ্ডিত কয়েদীই প্রায় এক রকম ব্যবহার পায়। কঠোর বা লঘু পরিশ্রমের সঙ্গে সব সময় অপরাধের গুরুত্বের বা লঘুত্বের বড় একটা সম্বন্ধ থাকে না। যে সময় কোথাও নারিকেল ছোবড়ার তার (coir) পাঠাইবার দরকার হয় সে সময় সকলকেই ছোবড়া কুটিতে লাগাইয়া দেওয়া হয়, আর যখন নারিকেল বা সরিষার তেলের আবশ্যক হয় তখন একটু মোটাসোটা সকলকেই ধরিয়া ঘানিগাছে জুড়িয়া দেওয়া হয়। সবটাই ব্যবসাদারী কাণ্ড! কয়েদী সরকার বাহাদুরের গোলাম; আপনাদের দেহের রক্ত জল করিয়া সরকারী কোষাগার পূর্ণ করাতেই তাহাদের অস্তিত্বের সার্থকতা!

অপরাধের তারতম্য অনুসারে কয়েদীকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করিবার প্রথা সরকারী পুঁথিতে আছে বটে, কিন্তু কার্য্যকালে তাহা ঘটিয়া উঠে না। কিসে জেলের আয় বৃদ্ধি হয়, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া চুণো পুঁটি অফিসার পর্য্যন্ত সকলেরই সেই দিকে দৃষ্টি। কয়েদী মরুক আর বাঁচুক, কে তাহার খবর রাখে? ভারতবর্ষে লোকের অভাবও নাই আর মাসে মাসে জাহাজ বোঝাই করিয়া দরকার মত কয়েদী সরবরাহ করিবার জন্য বিলাতী বিচারকেরও অভাব নাই।

একবার একটী পাগলকে জেলখানায় দেখিয়াছিলাম। বেচারীর

বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়; জেলখানায় সে ঝাড়ুদারের কাজ করিত। তাহার নিজের বাড়ীর সম্বন্ধেও তাহার ধারণা অতি অস্পষ্ট; কেন যে সে সাজা পাইয়া কালাপানিতে আসিয়াছে তাহাও ভাল করিয়া বুঝিত না। এক দিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমরা ক ভাই?" সে উত্তর করিল—"সাত।" তাহাদের নাম করিতে বলায় সে আঙ্গুলের গাঁট গণিয়া পাঁচ জনের নাম করিল। বাকি দুইজনের নাম করিতে বলায় উত্তর দিল—"ভুলে গেছি।" তাহার খাওয়া-পরার বড় একটা ঠিকানা থাকিত না; কখন আপন মনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত; কখনও বা সারাদিন রাস্তা পরিষ্কার করিয়া বেড়াইত। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, লোকটার মাথা খারাপ। তাহাকে পাগলা গারদে না দিয়া কোন্ সুবিচারক যে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। এরূপ দৃষ্টান্ত জেলখানায় অনেক পাওয়া যায়।

তবে মাঝে মাঝে দুই একজন এমন ওস্তাদ মিলে যাহারা কাজের ভয়ে পাগল সাজে। একজন বাঙালীকে ঐরূপ দেখিয়াছিলাম। একদিন বেগতিক বুঝিয়া সে মাথায় কাপড় বাঁধিয়া গান জুড়িয়া দিল। চোখে চূণের সামান্য গুড়া লাগাইয়া চোখ দুইটা লাল করিয়া লইল; আর আবল তাবল বকিতে আরম্ভ করিল। ভাত খাইবার সময় মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। প্রহরীরা তাহাকে জেলারের কাছে ধরিয়া লইয়া গেল। জেলার গোটা দুই কলা আনিয়া তাহার হাতে দিলেন। সে কলা দুটো খাইয়া পরে খোসাগুলোও মুখে পুরিয়া চিবাইতে লাগিল। জেলার স্থির করিলেন লোকটা সত্য সত্যই পাগল; তা' না হইলে খোসা চিবাইতে যাইবে কেন? লোকটা ফিরিয়া আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাঁরে, খোসা চিবুতে গেলি কেন?" সে বলিল—"কি করি,

বাবু সাহেব, বেটাকে ত বোকা বানাতে হবে! একটু কষ্ট না করলে কি আর পাগল হওয়া চলে?"

দশম পরিচ্ছেদ

বাংলা ভাষায় "উঠ্‌তে লাথি, বস্‌তে ঝাঁটা" বলিয়া যে একটা কথা আছে তাহার অর্থ যে কি তাহা জেলখানায় দুই চারি দিন থাকিতে থাকিতেই বেশ বুঝিতে পারিলাম। একেত আমাদের পরস্পরের সহিত কথা কহিবার জো নাই; তাহার উপর যেখানে আমাদের রাখা হইয়াছিল সেখানে শুধু মাদ্রাজী আর ব্রহ্মদেশীয় লোক! কাহারও কথার এক বর্ণও বুঝিবার উপায় নাই। আহারের ব্যবস্থা দেখিলে প্রবল বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। রেঙ্গুন চালের ভাত, ও মোটা মোটা রুটি, এ না হয় এক রকম চলে; কিন্তু কচুর গোড়া, ডাঁটা ও পাতা, চুপড়ি আলু; খোসাসমেত কাঁচা কলা ও পুঁই শাক; ছোট কাঁকর আর ইন্দুরনাদি এক সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া যে পরম উপাদেয় ভোজ্য প্রস্তুত হয়, তরকারীর বদলে তাহার ব্যবহার করিতে গেলে চক্ষে জল না আসে, বাঙলা দেশে এমন ভদ্রলোকের ছেলে এ দুর্ভিক্ষের বৎসরেও বড় বিরল।

কাজ কর্ম্মের ব্যবস্থাও বেশ চমৎকার। কালাপানিতে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল জন্মায়। সেগুলি সবই সরকারী সম্পত্তি। সেই জন্য সেখানে প্রধানতঃ নারিকেল লইয়াই কারবার। নারিকেলের ছোবড়া পিটিয়া তার বাহির করা ও তাহা হইতে দড়ি পাকান, শুষ্ক নারিকেল ও সরিষা ঘানিতে পিষিয়া তেল বাহির করা, নারিকেলের মালা হইতে হুঁকার খোল প্রস্তুত করা—এই সমস্তই জেলখানার প্রধান কাজ। এ ভিন্ন এখানে বেতের কারখানাও আছে; তাহাতে প্রধানতঃ অল্পবয়স্ক ছেলেরাই কাজ করে।

ঘানি ঘুরান ও ছোবড়া পেটাই সব চেয়ে কঠিন। আমাদের মধ্যে বারীন্দ্র ও অবিনাশ নিতান্ত দুর্ব্বল ও রুগ্ন বলিয়া তাহাদিগকে দড়ি পাকাইতে দেওয়া হইল; অপর সকলের ভাগ্যে ছোবড়া পেটা মিলিল। সকাল বেলা উঠিয়া শৌচকর্ম্মের কিঞ্চিৎ পরেই সকলে অন্ন বা "কঞ্জি" গলাধঃকরণ করিয়া "ল্যাঙ্গোটি" আঁটিয়া ছোবড়া পিটিতে বসিয়া যাইতে হয়। প্রত্যেককে বিশটী নারিকেলের শুষ্ক ছোবড়া দেওয়া হয়। একখণ্ড কাঠের উপর এক একটি ছোবড়া রাখিয়া একটী কাঠের মুগুর দিয়া তাহা পিটিতে পিটিতে ছোবড়াটী নরম হইয়া আসে। ছোবড়াগুলি পিটিয়া নরম হইলে তাহাদের উপরকার খোসা উঠাইয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর সেইগুলি জলে ভিজাইয়া পুনরায় পিটিতে হয়। পিটিতে পিটিতে ভিতরকার ভুসি ঝরিয়া গিয়া কেবলমাত্র তারগুলিই অবশিষ্ট থাকে। এই তারগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া পরিষ্কার করিয়া প্রত্যহ এক সেরের একটী গোছা প্রস্তুত করিতে হয়।

প্রথম দিন এই ছোবড়া পেটা ব্যাপারটা হাঁ করিয়া বুঝিতেই আমাদের অনেকক্ষণ গেল; তাহার পর পিটিতে গিয়া দেখিলাম হাতময় ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত দিন মাথা খুঁড়িয়া কোনও রকমে আধ পোয়া তার প্রস্তুত করিলাম। অষ্টমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে যখন বেলা তিনটার সময় কাজ দাখিল করিতে হাজির হইলাম, তখন দাঁত খিচুনির বহর দেখিয়াই চক্ষু স্থির হইয়া গেল। গালাগালিটা নির্ব্বিবাদে হজম করিবার সু-অভ্যাস কস্মিনকালেও ছিল না; আজ বিদেশে এই শক্রপুরীর মধ্যে কঠোর পরিশ্রম ও গালাগালি সম্বল করিয়া দীর্ঘজীবন কাটাইতে হইবে ভাবিয়া যেন প্রাণটা হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। আর সে গালাগালির বা কি বাহার! শরৎবাবুর কি একখানা বইএ পড়িয়াছিলাম যে গালাগালিতে হিন্দুস্থানীর মত

লম্বা জিহ্বা আর কোন জাতির নাই। তাঁহাকে একবার পোর্টব্লেয়ারে গিয়া ভাষাতত্ত্বের অনুশীলন করিতে আমাদের সবিনয় অনুরোধ। হিন্দুস্থানীর সহিত পাঞ্জাবী পাঠান ও বেলুচ মিশিয়া যে অমৃতের উৎস সেখানে খুলিয়া দিয়াছে, তাহার আস্বাদন একবার যাহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে, সেই মজিয়াছে। সাত জন্ম সে ভাষা চর্চ্চা করিলেও আমাদের দেশের হাড়ী, বাগ্দী পর্য্যন্ত সে রসে সম্যক অধিকারী হইতে পারিবে কি না সন্দেহ। বীভৎসতার মধ্যে এত রকমারি থাকিতে পারে, পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না।

মাঝে মাঝে এক আধজন প্রহরী একটু ভাল কথাও বলিত। একদিন সন্ধ্যার সময় গালাগালি খাইয়া মুখ চূণ করিয়া কুঠরির মধ্যে বসিয়া আছি এমন সময় একজন পাঠান প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু, কি হয়েছে?" আমি গালাগালি খাওয়ার কথা বলিলাম। সমস্ত শুনিয়া সে বলিল—"দেখ বাবু, আমি প্রায় চার পাঁচ বৎসর এই জেলে আছি। গালাগালি খেয়ে যারা মন গুমরে বসে থাকে তারা হয় পাগল হয়ে যায়, নয় ত মারামারি করে ফাঁসি খায়। ও সব মন থেকে ঝেড়ে ফেলাই ভাল। খোদাতালার হুকুমে এমন দিন চিরকাল থাকবে না।" অযাচিত উপদেশ প্রায়ই ভাল লাগে না, কিন্তু পাঠানের মুখে খোদা-তালার নাম সে রাত্রে বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল। মানুষ যখন সব আশ্রয় হারাইয়া দিশেহারা হইয়া পড়ে তখন অগতির গতিকে তাহার মনে পড়ে। সেই জন্যই জেলখানায় দেখিতে পাই যে যাহারা দুর্দ্দান্ত পাষণ্ড তাহারাও এক একগাছা মালা লইয়া নাম জপ করে। প্রথম প্রথম এসব দেখিয়া বড় হাসি পাইত। তাহার পর মনে হইতে লাগিল—ইহাতে হাসিবার কি আছে? আর্ত্তভক্তও ত ভগবানের ভক্তের মধ্যে গণ্য।

ছোবড়া পিটিয়া, কচু পাতার তরকারী ও গালাগালি খাইয়া এক-

রকমে ত দিনগত পাপক্ষয় করিতে লাগিলাম; কিন্তু উপদেবতাদের দৌরাত্মে ক্রমে জীবন প্রায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল। দেশের জেলে যেমন 'মেট' ও কালাপাগড়ী, কালাপানিতে সেইরূপ warder, petty officer, tindal ও জমাদার। সাধারণ কয়েদীই পাঁচ সাত বৎসর সাজা কাটিবার পর এই সব পদে উন্নীত হয়; কিন্তু কালাপানিতে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুবিধ কর্ম্মের ভার ও কর্ত্তৃত্ব ইহাদের উপর ন্যস্ত। যমরাজার কারাধ্যক্ষের ইহারাই প্রহরী। ছেলেবেলা একজন সুরসিক বাঙালী বক্তার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, যিনি "আষ্টে পিষ্টে" মারেন তিনিই "মাষ্টার"। আমারও সেইরূপ মনে মনে একটা বেশ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে "প্রহার" শব্দের সহিত "প্রহরী" শব্দের নিশ্চয় একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। গালাগালি ও মারপিটে ইহারা সকলেই সিদ্ধহস্ত। "রামলাল ফাইলে টেড়া হইয়া বসিয়াছে,দাও উহার ঘাড়ে দুইটা রদ্দা; মুস্তফা আওয়াজ দিবামাত্র খাড়া হয় নাই, অতএব উহার গোঁফ ছিঁড়িয়া লও; বকাউল্লার পায়খানা হইতে ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছে, অতএব তিন ডাণ্ডা লাগাইয়া উহার পশ্চাদ্দেশ ঢিলা করিয়া দাও।" এইরূপ বহুবিধ সদ্‌যুক্তি প্রয়োগে তাঁহারা জেলখানার শাস্তি (discipline) রক্ষা করেন।

কয়েদীরা অনেক সময় গলার মধ্যে গর্ত্ত করিয়া পয়সা-কড়ি লুকাইয়া রাখে; নানারূপে অত্যাচার করিয়া কয়েদীর নিকট হইতে সেই পয়সার ভাগ আদায় করাই প্রহরীদের প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের ত পয়সা-কড়ি নাই, আমরা যাই কোথায়? বারীন্দ্র নিতান্ত জীর্ণশীর্ণ বলিয়া হাসপাতাল হইতে তাহার প্রত্যহ বারো আউন্স দুগ্ধ পাইবার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের petty officer খোয়েদাদ মিঞার মুখে সেই দুধটুকু ঢালিয়া দিয়া তবে সে অত্যাচারের হাত হইতে নিস্তার পাইত! খোয়েদাদ একজন প্রচণ্ড নমাজী মোল্লা; পুরাদস্তুর "খোদাকা বন্দা।" তিনি তাঁহার গোঁফছাঁটা

মুখখানির মধ্যে দুধটুকু ঢালিয়া দিতে দিতে বলিতেন—"ইয়াঃ বিসমিল্লা! খোদানে কেয়া আজব্ চিজ পয়দা কিয়া!"

আরও বিপদের কথা এই, এ সকল অত্যাচারের প্রতিকার নাই। রক্ষকই যেখানে ভক্ষক সেখানে প্রাণ বাঁচে কিরূপে?

এইরূপে ছয় মাস যাইতে না যাইতে নাসিক, খুলনা ও এলাহাবাদ হইতে দশ বারো জন রাজনৈতিক কয়েদী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বসমেত আমাদের সংখ্যা হইল প্রায় বিশ বাইশ জন।

এই সময় আমাদের ভাগ্যগগনে নূতন জেল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টরূপী এক ধূমকেতুর উদয় হইল। আমাদের কপাল এইবার পুরাপুরি ভাঙ্গিল। তিনি আসিবার কিছুদিন পরেই আমাদের জনকতককে ঘানিতে দিয়া তেল পিষাইবার ব্যবস্থা করিলেন। উল্লাসকরকে যে সরিষা পিষিবার ঘানিতে জোড়া হইল তাহা অনেকটা আমাদের কলুর বাড়ীর দেশী ঘানির মত; আর হেমচন্দ্র, সুধীর, ইন্দু প্রভৃতি বাকি কয়জনকে যে ঘানিতে পাঠান হইল তাহা হাত দিয়া ঘুরাইতে হয়। প্রত্যহ এক একজনকে দশ পাউণ্ড সরিষার তেল বা ত্রিশ পাউণ্ড নারিকেল তেল পিষিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। মোটা মোটা পালোয়ান লোকও ঘানি ঘুরাইতে হিমসিম খাইয়া যায়; আর আমাদের যে কি দশা হইল তাহা মুখে অবর্ণনীয়। জেলের যে অংশে তেল পেষা হয় দুইজন পাঠান পেটী অফিসার তখন সেখানকার হর্ত্তাকর্ত্তা। সেখানে ঢুকিবামাত্র তাহাদের মধ্যে একজন তাহার বদ্ধমুষ্টি আমাদের নাকের উপর রাখিয়া বেশ জোর গলায় বুঝাইয়া দিল যে কাজকর্ম্ম ঠিক ঠিক না করিতে পারিলে সে আমাদের নাকগুলি ঘুসার চোটে থ্যাবড়া করিয়া দিবে। কিন্তু নাকের ভবিষ্যৎ দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া সময় নষ্ট করিবার উপায় নাই। তাড়াতাড়ি কাঁধের উপর পঞ্চাশ পাউণ্ড নারিকেলের বস্তা ও হাতে একটা বালতি লইয়া তেতলায়

চড়িয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। আর সে ত কাজ নয়; রীতিমত মল্লযুদ্ধ। আট দশ মিনিটের মধ্যেই দম চড়িয়া জিভ শুকাইতে আরম্ভ হইল। এক ঘণ্টার মধ্যেই গা হাত পা যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। রাগের চোটে মনে মনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম, কিন্তু সে নিষ্ফল আক্রোশ। একবার মনে হইল ডাক ছাড়িয়া কাঁদিলে বুঝি এ জ্বালা মিটিবে, কিন্তু লজ্জায় তাহাও পারিলাম না। দশটার ঘণ্টার পর যখন আহার করিতে নীচে নামিলাম, তখন হাতে ফোস্কা পড়িয়াছে, চোখে সরিষার ফুল ফুটিতেছে আর কানে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিতেছে। প্রথমেই দেখিলাম বৃদ্ধ হেমচন্দ্র এককোণে চুপচাপ বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"দাদা, কি রকম?" দাদা হাত দু'-খানা দেখাইয়া বলিলেন—"দারুভূতো মুরারি।" কিন্তু হাত দুখানা আড়ষ্ট হইয়া দারুময়ই হোক আর পাষাণময়ই হোক, তাঁহার মনের জোর কখনও একবিন্দু কমিতে দেখি নাই। দুঃখকষ্ট হাসিমুখে সহ্য করিতে, তীব্র যন্ত্রণার মাঝখানে অবিচলিতভাবে ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য স্থির করিতে হেমচন্দ্র একরূপ অদ্বিতীয়। হেমচন্দ্রকে আত্মহারা হইতে কেহ বড় একটা দেখে নাই। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যখন কেহ কেহ একটা যা-হয়-কিছু করিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিয়াছে তখন হেমচন্দ্রই আপনার মনের বল তাহাদের মধ্যে সংক্রামিত করিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছেন।

অতটা মনের জোর আমাদের ছিল না। একে ত আন্দামান নিকোবর ম্যানুয়াল অনুসারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর মানে পঁচিশ বৎসর এই রূপ কর্ম্মভোগ; তাহার পরও খালাস পাওয়া সরকার বাহাদুরের ইচ্ছাধীন। মনে হইতে লাগিল গলায় একগাছা দড়ি লাগাইয়া না হয় ঝুলিয়া পড়ি; কিন্তু সাহসে কুলাইল না। কাজে কাজেই যথাসাধ্য তৈল পিষিয়া সরকারী তেলের গুদাম ভর্ত্তি করিতে লাগিলাম।

এক দিনের দুর্দ্দশার কথা বেশ মনে পড়ে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘানি ঘুরাইয়াও ত্রিশ পাউণ্ড তেল পুরা করিতে পারিলাম না। হাত পা এমনি অবশ হইয়া গিয়াছে যে, মনে হইতেছিল বুঝি বা মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাই। তাহার উপর সমস্ত দিন প্রহরীদের কাছে কাজের জন্য গালি খাইয়াছি। সন্ধ্যাবেলা আমাকে জেলারের নিকট লইয়া গেল। জেলার ত সুশ্রাব্য ভাষায় আমার পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া পশ্চাদ্দেশে বেত লাগাইবার ভয় দেখাইলেন। ফিরিয়া আসিয়া যখন ভাত খাইতে বসিলাম তখন খাইব কি, দুঃখ ও অভিমানে পেট ফুলিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া দিয়াছে। একজন হিন্দু প্রহরীর মনে একটু দয়া হইল; সে বলিল—"বাবুলোক তকলিফমে হৈ; খানা জাস্তি দেও।" কথাগুলা শুনিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিবার প্রবৃত্তি হইল। নিজের গলাটা নিজের হাতে চাপিয়া ধরিলাম। এ সময় লাথি ঝাঁটা সহ্য করা যায়; কিন্তু সহানুভূতি সহ্য হয় না।

রবিবারেও কর্ম্মের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। নীচে হইতে বালতি বালতি জল উঠাইয়া দোতলা ও তেতলার বারান্দা নারিকেল ছোবড়া দিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিতে হইত। একদিন ঐরূপ পরিষ্কার করিবার সময় দেখিলাম উল্লাসকর কিছু দূরে কাজ করিতেছে। কথা কহিবার হুকুম নাই, তবু কথা কহিবার বড় সাধ হইল। দুই এক [illegible] করিয়া অগ্রসর হইয়া উল্লাসের কাছাকাছি গিয়া তাহাকে ডাকিবামাত্র আমার পিঠের উপর গুম্ করিয়া একটা বিষম কিল পড়িল। পিছনে মুখ ফিরাইবা মাত্র গালে আর এক ঘুসি! মূর্ত্তিমান যমদূতসদৃশ পাঠান প্রহরী মহম্মদ সা এইরূপে সরকারী হুকুম তামিল ও জেলের শান্তিরক্ষা করিতেছেন।

সেবার কিছুদিন এইরূপে কাটাইয়া ঘানির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। কিন্তু জেলার নাছোড়বান্দা। দিন কতক পরেই আবার

ঘানিতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু আমি তখন মোরিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছি। একেবারে সাফ জবাব দিয়া ব'সলাম—"আমি ঘানি পিষব না, তুমি যা করতে পার কর।" জেলার ত অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। একটা কুঠরীতে বন্ধ রাখিয়া পর্য্যায়ক্রমে হাতকড়ি বেড়ী ও কঞ্জির (penal diet) ব্যবস্থা হইল। শেষে শরীর যখন নিতান্তই ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল তখন আবার ছোবড়া পিটিবার অধিকার পাইলাম কিন্তু ছোবড়া পিটিয়াই কি শান্তি আছে? প্রহরী, বিশেষতঃ পাঠান ও পাঞ্জাবী মুসলমানেরা স্থির করিয়া লইয়াছিল যে আমাদের দাবাইতে পারিলেই কর্ত্তৃপক্ষের প্রিয়পাত্র হওয়া যায়। কাজেই তাহারা সর্ব্বদা আমাদের বিপদে ফেলিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া থাকিত। ছোটখাট খুঁটিনাটি লইয়া যে কতজনকে বিপদে পড়িতে হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। একদিন কুঠরীর মধ্যে পায়ে বেড়ী দিয়া শুষ্ক ছোবড়া পিটিতেছি। দারুণ গ্রীষ্মে ও কঠোর পরিশ্রমে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ঘামের স্রোত ছুটিয়াছে, ছোবড়া পিটিবার মুগুর মাঝে মাঝে লাফাইয়া লাফাইয়া আমারই মাথা ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় কুঠরীর বাহিরে একজন পাঞ্জাবী মুসলমান প্রহরীকে দেখিয়া ছোবড়াগুলো ভিজাইবার জন্য একটু জল চাহিলাম। সে একেবারে দাঁতমুখ খিঁচাইয়া জবাব দিল—"না, না, হবে না, ঐ শুকনো ছোবড়াই পিট্‌তে হবে।" আমারও মেজাজটা বড় সুবিধার ছিল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"জল না হয় নাই দেবে, কিন্তু অত দন্ত বিচ্ছেদ করছ কেন? প্রহরী রুখিয়া দাঁড়াইল "কেয়া গোস্তাকি করতা?" আমি দেখিলাম এখন আর হটিয়া যাওয়া চলে না। বলিলাম—"কেন, তুমি নবাবজাদা নাকি?" বলিবামাত্র প্রহরী জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া আমার গলার হাঁসুলি ধরিয়া এমনি টান মারিল যে, জানালার

লোহার গরাদের উপর আমার মাথা ঠুকিয়া গেল। রাগটা এত প্রচণ্ড হইয়া উঠিল যে, লোকটা যদি কুঠরীর ভিতরে থাকিত তাহা হইলে হয়ত তাহার মাথায় মুগুর বসাইয়া দিতাম। কিছু একটা না করিলেই নয়, কিন্তু করিবই বা কি? শেষে তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া এমনি কামড় বসাইয়া দিলাম যে তাহার হাত কাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। হাত লইয়া সে জেলারের কাছে নালিশ করিতে ছুটিল কিন্তু রাস্তার মাঝখানে আমাদের বন্ধু একজন হিন্দু পেটি অফিসার (petty officer) তাহাকে কতকটা ভাল কথা বলিয়া কতকটা ভয় দেখাইয়া ফিরাইয়া লইয়া আসিল। প্রহরীদের সঙ্গে আরও দুএক-বার এইরূপ ঝগড়া হইয়াছে কিন্তু দেখিয়াছি যাহাদের নিকট তাহারা হারিয়া যায় তাহাদেরই ভক্ত হইয়া পড়ে। দুর্ব্বলের উপর নির্য্যাতন সব জায়গায়ই হয়, আর সে নির্য্যাতন পাঠানেরাই বেশী করে। কিন্তু পাঠানদের সহস্র দোষ সত্ত্বেও একটা গুণ দেখিয়াছি যে, যাহাকে একবার বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়, নিজের মাথায় বিপদ লইয়াও তাহার সাহায্য করে। তাহাদের মধ্যে নৃশংসতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহাদের মনের দৃঢ়তা আমাদের দেশের লোকের চেয়ে অধিক। ধর্ম্ম-ঘটের সময় জেলার আমাদের দাবাইবার জন্য আমাদের উপর পাঠান প্রহরী লাগাইয়া দিত কিন্তু পাঠান অনেক সময় বিশেষ ভাবে আমাদের বন্ধু হইয়া উঠিত। জেলে দলাদলির অন্ত নাই। প্রবল দলকে আপনাদের স্বপক্ষে রাখিয়া আমরা আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতাম।

হিন্দুমুসলমানের ভেদটা জেলখানার মধ্যে মাঝে মাঝে তীব্র হইয়া উঠিত। স্বধর্ম্মীদের উপর টানটা মুসলমানদের মধ্যে স্বভাবতঃই একটু বেশী; সেজন্য জেলের মধ্যে কর্ত্তৃত্বের জায়গাগুলা যাহাতে মুসলমান-দের হাতেই থাকে এজন্য তাহারা সর্ব্বদা চেষ্টা করিত। অধিকন্তু

নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাহারা হিন্দুকে মুসলমান করিতে পারিলেও ছাড়িত না। কোনরূপে হিন্দুকে মুসলমান ভাণ্ডারার খানা খাওয়াইয়া তাহার গোঁফ ছাঁটিয়া দিয়া একবার কলমা পড়াইয়া লইতে পারিলে বেহেস্তে যে খোদাতাল্লা তাহাদের জন্য বিশেষ আরামের ব্যবস্থা করিবেন এ বিশ্বাস প্রায় সকল মোল্লারই আছে। আর কালাপানির আর্ত্তভক্তদের মধ্যে মোল্লারও অসদ্ভাব নাই। কাজে কাজেই হিন্দুর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ লইয়া উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মধ্বজীদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া ঝগড়ি চলিত। একজন হিন্দু বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ছেলে যদি ঘানি পিষিতে যায় তাহা হইলে পাঁচ সাতজন মোল্লা মিলিয়া তাহাকে নানারূপ বিপদে ফেলিবার ষড়যন্ত্র করে আর সে যদি মুসলমান হয় তাহা হইলে যে কিরূপ পরম সুখে দিন কাটাইতে পারিবে সে সম্বন্ধে নানারূপ প্রলোভন দেখায়। মুসলমানদের মত আর্য্যসমাজীরাও জেলের মধ্যে প্রচার কার্য্য চালাইতে থাকে এবং ধর্ম্মভ্রষ্ট হিন্দুকে আর্য্যসমাজভুক্ত করিয়া লইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে সেরূপ কোন আগ্রহ দেখা যায় না! তাহারা দল হইতে বাহির করিয়া দিতেই জানে, নূতন কাহাকেও দলে টানিয়া লইবার সামর্থ্য তাহাদের নাই! এই দলাদলির ফলে আর কিছু হোক আর নাই হোক হিন্দুর টিকি ও মুসলমানের দাড়ী সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। বাংলার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যাহারা দেশে কস্মিনকালেও টিকি রাখে না তাহারাও কালাপানিতে গিয়া হাত দেড়েক টিকি গজাইয়া বসে আর মুসলমানেরা দুলিয়া দুলিয়া "আলীর সহিত হনুমানের যুদ্ধ" "শিবের সহিত মহম্মদের লড়াই", "সোণাভান বিবির কেচ্ছা" প্রভৃতি অদ্ভুত অদ্ভুত উপাখ্যান পাঠ করিয়া পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করিতে লাগিয়া যায়। আমরা হিন্দু মুসলমান সকলকার হাত হইতেই নির্ব্বিচারে রুটি খাই

দেখিয়া মুসলমানেরা প্রথম প্রথম আমাদের পরকালের সদ্গতির আশায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, হিন্দুরা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল; শেষে বেগতিক দেখিয়া উভয় দলই স্থির করিল যে আমরা হিন্দুও নই মুসলমানও নই—আমরা বাঙালী! রাজনৈতিক কয়েদী মাত্রেরই শেষে সাধারণ নাম হইয়া উঠিল—বাঙালী।

দুঃখের কথা, লজ্জার কথাও বটে যে দলাদলিটা শুধু সাধারণ কয়েদীদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না; রাজনৈতিক কয়েদীদের মধ্যেও দলাদলির অভাব ছিল না। আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই দলাদলির বেশ পুষ্টি হইতে লাগিল। যাঁহারা টলষ্টয়ের (Tolstoy) Resurrection নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, সে পুস্তকখানিতে বিপ্লবপন্থীদিগের মনোস্তত্ত্বের কিরূপ সুন্দর চিত্র বর্ণিত হইয়াছে। সে বর্ণনা যে কত সত্য তাহা নিজেদের দলের দিকে লক্ষ্য করিয়াই বুঝিতে পারিলাম। বাস্তবিকই সাধারণ বিপ্লবপন্থীরা নিজেদের একটু বড় করিয়াই দেখে। একটু অহঙ্কার ও আত্মবিশ্বাসের মাত্রা বেশী করিয়া থাকে বলিয়াই হয়ত তাহারা কাজে অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় তাহাদের চরিত্রে যতখানি তীব্রতা থাকে ততখানি গভীরতা থাকে না। তাহারা সাধারণতঃ কল্পনাপ্রবণ ও একদেশদর্শী; এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই neurotic। রাজনৈতিক কয়েদীদের মধ্যে নূতন ছেলে আসিলেই আমি সন্ধান লইতাম যে তাহাদের পিতৃকুলে বা মাতৃকুলে তিন পুরুষের মধ্যে কেহ বায়ুরোগগ্রস্ত ছিলেন কি না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বায়ুরোগের ইতিহাস পাইতাম। আমার পুরাতন বন্ধুবর্গ কথাটা শুনিয়া আমার উপর চটিয়া যাইবেন, কিন্তু ক্রোধের সেরূপ অপব্যয় করিবার কোনও কারণ নাই, কারণ আমিও তাঁহাদের দলভুক্ত এবং আমার পিতামহী বায়ুরোগগ্রস্ত ছিলেন।

বিপ্লবপন্থীদিগের এই চরিত্রগত বিশেষত্ব জেলের বাহিরে কাজকর্ম্মের উত্তেজনায় অনেক সময় চাপা পড়িয়া থাকে কিন্তু জেলের ভিতর অন্যরূপ উত্তেজনার অভাবে তাহা নানারূপ নিরর্থক দলাদলির রূপ ধরিয়া দেখা দেয়। কোন্ দল বেশী কাজ করিয়াছে, কোন্ দল ফাঁকি দিয়াছে, কোন্ নেতা সাঁচ্চা আর কোন্ নেতা ঝুটা—এরূপ গবেষণার আর অন্ত ছিল না! এবং প্রায় প্রত্যেক দলই আপনাকে 'আদি ও অকৃত্রিম' বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে সত্য মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিত। এই প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টার সহিত প্রাদেশিক ঈর্ষা মিশিয়া ব্যাপারটাকে বেশ বীভৎস করিয়া তুলিত। জাতীয় সম্মিলন ও ভারতীয় একতার দোহাই দিয়া কত অদ্ভুত জিনিস যে প্রচার করিবার চেষ্টা হইত তাহার আর ইয়ত্তা নাই। মারাঠী নেতারা মাঝে মাঝে প্রমাণ করিতে বসিতেন যে যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" গানে সপ্তকোটী কণ্ঠের কথা আছে, ত্রিশ কোটী কণ্ঠের কথা নাই, এবং যেহেতু বাঙালী কবি লিখিয়াছেন "বঙ্গ আমার, জননী আমার" সেই হেতু বাঙালীর জাতীয়তাবোধ অতি সঙ্কীর্ণ। একজন পাঞ্জাবী আর্য্যসমাজী নেতা তাঁহার বাঙালী-বিদ্বেষ প্রচার করিবার আর কোন রাস্তা না পাইয়া একদিন বলিয়াছিলেন যে যেহেতু রামমোহন রায় এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন করিবার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছিলেন সেহেতু তিনি দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক! এরূপ যুক্তির পাগলা-গারদ ভিন্ন আর অন্য উত্তর নাই। মারাঠী নেতাদের মনে এই বাঙালী-বিদ্বেষের ভাবটা কিছু বেশী প্রবল বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষে যদি একতা স্থাপন করিতে হয় তাহা হইলে তাহা মারাঠার নেতৃত্বেই হওয়া উচিত—ইহাই যেন তাঁহাদের মনোগত ভাব। হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবীরা গোঁয়ার, বাঙালী বাক্যবাগীশ, মাদ্রাজী দুর্ব্বল ও ভীরু—একমাত্র

পেশোয়ার বংশধরেরাই মানুষের মত মানুষ—নানা যুক্তি তর্কের ভিতর দিয়া এই সুরই ফুটিয়া উঠিত।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আমাদের নিজেদের অন্তর্বিরোধের ফলে আমরা অনেক দিন পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষের অত্যাচারে বাধা দিতে পারি নাই। শেষে কষ্টের যখন বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইল, তখন নিজেদের বিরোধ চাপা দিয়া ধর্ম্মঘটের আয়োজন আরম্ভ হইল। এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীমান নন্দগোপাল। নন্দগোপাল পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয়। দীর্ঘকায় সুপুরুষ, ১২৪-ক ধারায় অভিযুক্ত হইয়া দশ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরিত হন। তিনি ঘানিতে যাইয়া এক নূতন কাণ্ড করিয়া বসিলেন। প্রথমেই বলিলেন "অত জোরে ঘানি ঘুরান আমার পোষাইবে না।" ঘানি সাধ্যমত আস্তে আস্তে ঘুরিতে লাগিল; ফলে দশটার মধ্যে তেলের এক-তৃতীয়াংশও পেষা হইল না। দশটার সময় নীচে আসিয়া সাধারণ কয়েদীরা পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই তাড়াতাড়ি ভাত খাইয়া লইয়া আবার কাজ করিতে ছুটে। দশটা হইতে বারোটা পর্য্যন্ত আইন অনুসারে আহার ও বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও কাজ পাছে শেষ না হয় এই ভয়ে তাহারা বিশ্রাম লইতে সাহস করে না। কাজ শীঘ্র শেষ হইলে হাত পা ছড়াইয়া একটু জিরাইতেও পায়। নন্দগোপালের সে ভয় নাই। পেটি অফিসার আসিয়া তাড়াতাড়ি খাইয়া লইবার জন্য তাঁহার উপর হুকুম জারি করিল। নন্দগোপাল তাহাকে স্মিতবদনে স্বাস্থ্যনীতি বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, তাড়াতাড়ি আহার করিলে পাকস্থলীর বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা; আর দশ বৎসর যখন তাঁহাকে

সরকার বাহাদুরের অতিথি হইয়া থাকিতেই হইবে, তখন কোনও কারণে তিনি আপনার স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া সরকারের বদনাম করিতে অপারগ। জেলার সাহেবের কাছে রিপোর্ট পৌঁছিল; তিনি আসিয়া দেখিলেন নন্দগোপাল ধীরে ধীরে গ্রাস পাকাইয়া বত্রিশ দাঁতে চৌষট্টি কামড় মারিয়া এক এক গ্রাস গলাধঃকরণ করিতেছেন। খুব খানিকটা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তিনি নন্দগোপালকে বুঝাইয়া দিলেন যে, কাজ যথা সময়ে শেষ করিতে না পারিলে বৈত্রাঘাত অনিবার্য্য। নন্দগোপাল নিতান্ত ভদ্রভাবে স্বাস্থ্যনীতি পুনরাবৃত্তি করিয়া জেলার সাহেবকে মধুর হাস্যে জানাইলেন, যে সরকার বাহাদুর যখন দশটা হইতে বারোটা পর্য্যন্ত আহার ও বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তখন তিনি ত নিজে সে আইন ভঙ্গ করিবেনই না; অধিকন্তু জেলার সাহেবও যাহাতে সে আইন ভঙ্গ না করেন সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখিবেন। বলা বাহুল্য, জেলার সাহেবের অঙ্গ জুড়াইয়া দ্রব হইয়া গেল। তিনি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া মানে মানে প্রস্থান করিলেন। আহারাদি যথাসময়ে শেষ করিয়া নন্দগোপাল কুঠরীতে গিয়া ঢুকিলেন। বিব্রত পেটি অফিসার ভাবিল এইবার বুঝি কাজ আরম্ভ হইবে। নন্দগোপাল কিন্তু একখানি কম্বল লইয়া আস্তে আস্তে বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িলেন। অজস্র গালাগালিতেও তাঁহার বিশ্রামের ব্যাঘাত হইল না। Passive resistanceএ তিনি মহাত্মা গান্ধিরও গুরু। বারোটার সময় উঠিয়া নন্দগোপাল আরও একঘণ্টা ঘানি ঘুরাইলেন, যখন দেখিলেন যে, বালতিতে প্রায় পনেরো পাউণ্ড তেল হইয়াছে তখন বাকি নারিকেল বস্তায় বন্ধ করিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। কাজের ত অর্দ্ধেক মাত্র হইয়াছে, বাকি অর্দ্ধেক এখন করিবে কে? নন্দগোপাল বলিলেন, "যাহার খুসি সেই করিবে। আমি

সত্যই কলুর বলদ নই, যে, সমস্ত দিনই তেল পিষিব। দিনে ত ছয় পয়সারও খোরাক পাই না, তা ত্রিশ পাউণ্ড তেল পিষিব কেমন করিয়া?

কর্ত্তৃপক্ষ মহলে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। তর্জ্জন গর্জ্জন অনেক হইল; কিন্তু নন্দগোপাল নির্ব্বিকার পরমপুরুষের মত নিস্পন্দ এবং সদা স্মিতবদন। নন্দগোপালের নিকট হইতে ত্রিশ পাউণ্ড তেল বাহির হইবার কোন আশাই নাই দেখিয়া সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেব তাঁহাকে পায়ে বেড়ী দিয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য (till further orders) কুঠরীতে বন্ধ রাখিতে আজ্ঞা দিলেন।

এইরূপে আরও এক মাস কাটিল। ইতিমধ্যে জেলার সাহেব নন্দগোপালের সহিত একটা রফা করিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, যে, চার দিন পূরা কাজ করিলে তিনি ভবিষ্যতে তাঁহাকে ঘানি ঘুরান হইতে অব্যাহতি দিবেন। নন্দগোপালও রাজি হইয়া অল্পাধিক পরিমাণে অপরের সাহায্যে চার দিন পূরা কাজ দাখিল করিয়া সে-যাত্রা নিষ্কৃতি পাইলেন।

এ নিষ্কৃতির আনন্দ কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হইল না। অল্প দিন পরেই আবার তাঁহাকে বড় ঘানিতে তেল পিষিতে দেওয়াতে তিনি সে কাজ করিতে অস্বীকৃত হন। ফল—বেড়ি ও কুঠরী বন্ধ। হুকুম হইল সকলকে পুনরায় তিন দিনের জন্য জেলে ঘানি ঘুরাইতে হইবে; একে ত আমরা সকলে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য জেলে আবদ্ধ, তাহার উপর প্রত্যহ এই ঘানির বিভীষিকা। সকলেই বুঝিলেন যে, কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে একটা সুবিধা রকমের পাকা বন্দোবস্ত করিয়া না লইতে পারিলে পোর্টব্লেয়ারেই ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে। সাজা ত আছেই, তবে আর নিজের হাতে নিজেকে শাস্তি দেওয়া কেন? অনেকেই এবার ঘানিতে কাজ করিতে অস্বীকার করিলেন। ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইল।

কর্তৃপক্ষও রুদ্রমূর্ত্তি ধরিলেন। জেলখানা ভরিয়া সে এক আনন্দোৎসব পড়িয়া গেল। সাজার উপর সাজা চলিতে লাগিল। চার দিন কঞ্জিভক্ষণ ও সাত দিন দাঁড়া হাতকড়ি, ইহাই সাধারণতঃ সাজার প্রথম কিস্তি। গুঁড়া চাউল ফুটন্ত গরম জলে ঢালিয়া দিলে যে সুখাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাই আমাদের কঞ্জি। তাহাই মাপিয়া এক এক পাউণ্ড করিয়া দিনে দুইবার খাইতে দেওয়া হয়, এবং কয়েদী কোনও উপায়ে আর কিছু সংগ্রহ করিয়া খাইতে না পায় সে বিষয়ে কড়া পাহারা থাকে। জেলের শাস্ত্র অনুসারে চার দিনের অধিক এ কঞ্জি (penal diet) খাওয়াইবার নিয়ম নাই; কিন্তু কর্তৃপক্ষের আমাদের উপর দয়ার আধিক্যবশতঃই হোক আর যে কারণেই হোক উল্লাসকর, নন্দগোপাল ও হোতিলালকে বারো তেরো দিন এই কঞ্জি খাওয়াইয়া রাখা হয়। ১৯১৩ সালে যখন শ্রীযুক্ত রেজিনাল্ড ক্র্যাডক পোর্টব্লেয়ার পরিদর্শন করিতে যান, তখন নন্দগোপাল তাঁহার নিকট এই সম্বন্ধে অভিযোগ করেন; কিন্তু সাজা দিলেও কর্তৃপক্ষগণ টিকিটে এ সম্বন্ধে কোনও কথা লিখেন নাই। জেলার সাহেবও অম্লানবদনে বলিলেন যে, অভিযোগ মিথ্যা। সুতরাং ফল কিছুই হইল না। জেলারের বিরুদ্ধে কয়েদীর কথা কোন কালেই প্রমাণিত হয় না।

সাজার পর সাজা চলিতে লাগিল; নানা রকমের বেড়ীর পালা শেষ করিয়া আমাদের কুঠরীতে বন্ধ করা হইল। তাহারও একটু রকমারি আছে। সাধারণ কয়েদীদের কুঠরী বন্ধ করা হইলে তাহারা নীচে আসিয়া স্নানাহার করিতে পারে; অপর কয়েদীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবারও তাহাদের বাধা নাই। এখন নূতন আজ্ঞা প্রচারিত হইল যে, আমাদের সঙ্গে কেহ কথা কহিলে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। সুতরাং নামে পৃথক কারাবাস (separate confinement) হইলেও

কার্য্যতঃ আমাদের পক্ষে উহা নির্জ্জন কারাবাস (solitary confinement) হইয়া দাঁড়াইল। অনেককেই তিন মাস বা ততোধিক কাল এইরূপ কুঠরী-বদ্ধ অবস্থায় কাটাইতে হইল।

অনেকেরই এই সময় স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল। একে পোর্টব্লেয়ারে ম্যালেরিয়ার প্রচণ্ড প্রকোপ; জ্বরজাড়ি লাগিয়াই আছে, তাহার উপর আমাশয় সুরু হইল। কর্ত্তৃপক্ষও বোধ হয় ভাবিলেন যে, ব্যবস্থার একটু পরিবর্ত্তন দরকার। সেই জন্য আমাদের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া জন কয়েককে করোনেশন উৎসবের সময় জেলের বাহিরে Settlementএ পাঠান হইল। বারীন্দ্র গেলেন Engineering fileএ, অর্থাৎ রাজ-মিস্ত্রীর সহিত মজুরী করিতে, উল্লাসকর গেলেন মাটি কাটিয়া ইট বানাইতে, কেহ গেলেন জঙ্গলে (Forest Department) কাঠ কাটিতে; কেহ বা রিক্‌শ টানিতে; আর কেহ বা গেলেন বাঁধ বাঁধিতে।

আমাদের কিন্তু অদৃষ্টগুণে 'উল্টা বুঝিলি রাম' হইয়া দাঁড়াইল। জেলখানার মধ্যে কাজ যতই কঠোর হোক না কেন, সরকার হইতে নির্দ্দিষ্ট খোরাক পাওয়া যাইত, আর জল-বৃষ্টিতে বেশী ভিজিতে হইত না। বাহিরে গিয়া সে সুখটুকুও চলিয়া গেল! প্রাতঃকালে ৬টা হইতে ১০টা ও অপরাহ্ণে ১টা হইতে ৪॥০টা পর্য্যন্ত কঠোর পরিশ্রম ত করিতেই হয়; অধিকন্তু রৌদ্রে পুড়িতে ও বৃষ্টিতে ভিজিতে হয়। বিশেষতঃ পোর্টব্লেয়ারে বৎসরে সাত মাস বর্ষাকাল, তাহার উপর জঙ্গলে জোঁকের উপদ্রব। জঙ্গলে কাজ করিবার ভয়ে কত লোক যে পলাইতে চেষ্টা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

একেত এই কষ্ট, তাহার উপর পূরা খোরাক মিলে না। কয়েদীর খোরাক চুরি হইয়া বাজারে ও গ্রামে গ্রামে বিক্রীত হয়। সাধারণ

কয়েদী হইতে ইউরোপীয় কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই এই চুরির কথা বেশ জানেন; কিন্তু চুরি কখনও বন্ধ হয় না। অধিকাংশ কর্ম্মচারীই ঘুষখোর; সুতরাং এ চুরি-রোগের প্রতিকার নাই। সাধারণ কয়েদী ইহার বিরুদ্ধে সহজে কিছু বলিতে চায় না; কেননা সে বিলক্ষণ জানে, যে, মুখ খুলিলেই তাহাকে বিপদে পড়িতে হইবে।

রোগীর জন্য জেলের বাহিরে চারিটি হাসপাতাল; কিন্তু সেগুলি বাঙালী **Asst. Surgeon**এর তত্ত্বাবধানে বলিয়া চীফ কমিশনার কর্ণেল ব্রাউনিং আদেশ দিলেন, যে, আমাদের অসুখ হইলে আমরা সে সমস্ত হাসপাতালে যাইতে পারিব না; আমাদিগকে জেলে ফিরিয়া আসিতে হইবে। জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে বিছানা ও থালা বাটী ঘাড়ে করিয়া পাঁচ-সাত-দশ মাইল হাঁটিয়া আসা বড় সুবিধার কথা নয়। আর জেলে আসিয়াই বা সুচিকিৎসা কোথায়? হাসপাতাল সংলগ্ন কতকগুলি ছোট ছোট কুঠরীর মধ্যে আমাদের দিনে প্রায় একুশ ঘণ্টা পড়িয়া থাকিতে হইত; আর সেই কুঠরীর মধ্যেই একটি গামলায় মল-মূত্র ত্যাগের বন্দোবস্ত। বৃষ্টির সময় পিছন দিকের ঘুলঘুলি দিয়া জলের ছাট আসিবার বেশ সুব্যবস্থা আছে কিন্তু কুঠরীতে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের তেমন উপায় নাই। ১৯২০ সালে জানুয়ারী মাসে যে জেল কমিশন পোর্টব্লেয়ার পরিদর্শন করিতে যান, তাঁহারা এই কুঠরীগুলির বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া এগুলির সংস্কার করিতে বলেন।

এত দিন আমরা ভাবিয়াছিলাম, যে, বুঝি জেলের বাহির হইতে পারিলেই আমাদের দুঃখ কতকটা ঘুচিবে; কিন্তু সে আশা এবার নির্ম্মূল হইল। আমাদের জন্য জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ; সাধারণ কয়েদী ক্রমে ওয়ার্ডার, পেটি অফিসার বা লেখাপড়া জানিলে মুন্সি হইয়া কঠোর কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পায়; কিন্তু আমাদের সে পথও বন্ধ।

এক এক করিয়া প্রায় সকলেই ক্রমে বাহিরের কাজ করিতে অস্বীকৃত হইয়া জেলে ফিরিয়া আসিলেন।

এই সময় একটী শোচনীয় ঘটনা ঘটিল। ইন্দুভূষণ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিল। তাহার বলিষ্ঠ শরীর কঠোর পরিশ্রমেও কখন কাতর হয় নাই; কিন্তু জেলখানার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপমানে সে যেন দিন দিনই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল; মাঝে মাঝে বলিত—'জীবনের দশটা বৎসর এই নরকে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। একদিন রাত্রে সে নিজের জামা ছিঁড়িয়া দড়ি পাকাইয়া পিছনের ঘুলঘুলিতে লাগাইয়া ফাঁসি খাইল। রাত্রেই জেলের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টকে টেলিফোন করা হইল, কিন্তু পরদিন বেলা ৮টা পর্য্যন্ত তাঁহার দেখা মিলিল না। সে দিন রাত্রে জেলারের সহিত যে সমস্ত প্রহরী ইন্দুভূষণের কুঠরীতে ঢুকিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে বলিল, যে, তাহার গলায় হাঁসুলিতে (neck ticket) একখণ্ড লেখা কাগজ বাঁধা ছিল। সত্যমিথ্যা ভগবান জানেন, কিন্তু সে কাগজের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। পরে আমরা জেলার সাহেবকে ঐ কাগজের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। পরে ইন্দুভূষণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলে পোর্টব্লেয়ারের ডেপুটী কমিশনারের উপর ঐ ভার অর্পিত হয়। ফলে কিন্তু কিছুই হইল না। ব্যাপারটা হ-য-ব-র-ল হইয়া চাপা পড়িয়া গেল।

এই সময়ে অনেকেই কাজের তাড়ায় বাহির হইতে ভিতরে চলিয়া আসিতে লাগিলেন। উল্লাসকরও তাহাই করিলেন। তাঁহাকে রৌদ্রে ইট তৈয়ার করিতে দেওয়া হইয়াছিল। সেখানকার হাসপাতালের যিনি Junior Medical Officer তিনি বলিলেন যে উল্লাস-

করের রৌদ্রে কাজ করা সহ্য হইবে না। কিন্তু বাঙালী ডাক্তারের কথা গোরা Overseer সাহেব গ্রাহ্য করিবেন কেন? উল্লাসকরকে সেই কার্য্যেই বহাল রাখা হইল। ফলে তিনি কাজ করিতে অস্বীকৃত হইয়া পুনরায় জেলে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, শুধু পীড়নের ভয়ে কাজ করিতে হইলে মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হইয়া যায়; সাজার ভয়ে কাজ করিতে তিনি রাজী নহেন। তাঁহার সাত দিন দাঁড়া হাতকড়ির বাবস্থা হইল। কিন্তু সাত দিন আর পূর্ণ হইল না। প্রথম দিনই বেলা ৪৷৷০টার সময় হাতকড়ি খুলিতে গিয়া পেটি অফিসার দেখিল যে, উল্লাসকর জ্বরে অজ্ঞান হইয়া হাতকড়িতে ঝুলিতেছে। তখনই তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠান হইল। রাত্রে শরীরের উত্তাপ ১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত চড়ে। প্রাতঃকালে দেখা গেল যে জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু উল্লাসকর আর সে উল্লাসকর নাই! আসন্ন বিপদের মধ্যেও যিনি চিরদিন নির্ব্বিকার, তীব্র যন্ত্রণায় যাঁহার মুখ হইতে কখনও হাসির রেখা মুছে নাই, তিনি আজ উন্মাদরোগগ্রস্ত।

জেলখানার প্রকৃত মূর্ত্তি যেন সেই দিন আমাদের চক্ষে ফুটিয়া উঠিল। বাঁচিয়া দেশে ফিরিবার ত আর আমাদের কোনও আশা নাই—কেহ ফাঁসি খাইয়া মরিবে, কেহ বা পাগল হইয়া মরিবে। আর যদি মরিতেই হয় তবে আর স্বহস্তে এই যন্ত্রণার বোঝা উঠান কেন? প্রায় সকলেই স্থির করিলেন যে, যত দিন আমাদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা না হয় তত দিন কাজ কর্ম্ম করা হইবে না। এদিকে আমরা ultimatum দিয়া তাল ঠুকিয়া মরিয়া হইয়া রহিলাম, ওদিকে কর্ত্তৃপক্ষও তাঁহাদের তূণ হইতে চোখা চোখা বাণ হানিতে আরম্ভ করিলেন।

বেশ একচোট গজকচ্ছপের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ইহার কিছু পূর্ব্বে

চুঁচুড়ার ননীগোপাল ও ঢাকার পুলিনবাবু প্রভৃতি তিন চার জন আসিয়া পৌঁছিলেন! ননীগোপাল ছেলেমানুষ হইলেও তাহাকে ঘানি প্রভৃতি কঠোর কর্ম্ম দেওয়া হয়। সেও বাধ্য হইয়া ধর্ম্মঘটে যোগ দিল। অন্য সকল কয়েদী হইতে পৃথক করিয়া আমাদের এক আলাদা ব্লকে বন্ধ রাখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের উপর বাছা বাছা পাঠান প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। খাদ্যের পরিমাণ আরও কমাইয়া দেওয়া হইল, এবং যাহাতে আমরা পরস্পরের সহিত কোনরূপ কথাবার্ত্তা চালাইতে না পারি সে বিষয়েও সতর্কতার অভাব রহিল না। পায়খানায় গিয়া পাছে কথা কহি সে জন্য সম্মুখে প্রহরী খাড়া থাকিত। কিন্তু বাঁধন বেশী শক্ত করিতে গেলে অনেক সময় ছিঁড়িয়া যায়; আর আইনের প্রতি যাহাদের ভক্তি নাই, শুধু ভয় দেখাইয়া তাহাদের আইন মানাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

আমরা প্রধানতঃ তিনটা জিনিস চাহিলাম—ভাল খাওয়া-পরা, পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি ও পরস্পরের সহিত মেলামেশার সুবিধা।

মধ্যে চার পাঁচ কুঠরী ব্যবধান রাখিয়া এক এক জনকে বন্ধ করা হইল। ফলে কথাবার্ত্তা আগে আস্তে আস্তে হইতেছিল, এখন চীৎকার করিয়া চলিতে লাগিল। হাতকড়িতে ঝুলাইয়া রাখিলেও মানুষের মুখ ত আর বন্ধ করা যায় না। কর্ত্তৃপক্ষের অবস্থা যেন সাপে ছুঁচো ধরা গোছ হইয়া দাঁড়াইল। সুনাম বা prestigeএর খাতিরে আমাদের আবদার শুনাও চলে না, আর এদিকে ধর্ম্মঘটও ভাঙ্গে না। এমন সময়ে আমাদের নূতন সুপারিনটেন্ডেণ্ট বদলি হইয়া পুরাতন সুপারিন্টেন্ডেণ্ট ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পরামর্শে চীফ কমিশনার আমাদের জন কয়েককে সহজ কাজ দিয়া জেলের বাহিরে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন।

আমরা বলিলাম যে সকলকে যদি জেলের বাহিরে পাঠান হয় তাহা হইলে আমরা বাহিরে কাজ করিতে স্বীকৃত হইব, নচেৎ পুনরায় জেলে ফিরিয়া আসিব।

প্রায় দশ বারো জনকে নারিকেল গাছের পাহারাওয়ালা করিয়া বাহিরে পাঠান হইল। নারিকেল গাছ সরকারী সম্পত্তি, তাহা হইতে নারিকেল না চুরি যায় ইহা দেখাই পাহারাওয়ালার কাজ। কাজ খুব সহজ, কিন্তু সকলকেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা হইল, পাছে পরস্পর দেখা শুনা হয়।

জেলখানায় কিন্তু ধর্ম্মঘট চলিতে লাগিল। নন্দগোপাল ও ননী-গোপালকে কিছুদিন পরে Viper দ্বীপে একটা ছোট জেলে বদলি করা হইল। সেখানে গিয়া ননীগোপাল আহার ত্যাগ করিল। জেল হইতে সকলকে বাহিরে পাঠাইবার যে কথা ছিল, তাহা আর কার্য্যে পরিণত হইল না।

এদিকে যাঁহাদিগকে জেলের বাহিরে কাজ করিতে পাঠান হইয়াছিল, তাঁহারাও একজোটে কর্ম্মত্যাগ করিলেন। পরস্পরের ঠিকানার সন্ধান লইয়া ধর্ম্মঘটের আয়োজন করিতে প্রায় এক মাস অতিবাহিত হইল। তিন মাসের সাজা লইয়া তাঁহারা যখন জেলে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখা গেল যে, জেলখানার ধর্ম্মঘট প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নিরাশ হইয়া অধিকাংশ লোকেই কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ননীগোপালকে চার দিন অনশনের পর জেলে ফিরাইয়া আনা হইল; নাকে রবারের নল পূরিয়া তাহার অল্প অল্প দুগ্ধপানের ব্যবস্থা করা হইল, পাছে সে মরিয়া গিয়া কর্ত্তৃপক্ষের বদ্‌নাম করে। সেবারকার ধর্ম্মঘটের কর্ম্মভোগের বোঝা ননীগোপাল, বীরেন প্রভৃতি দুই তিনটী ছেলেকেই বহিতে হয়। সাজার পর সাজা খাইয়া

বিফলমনোরথ হইয়া একে একে সকলেই ধর্ম্মঘট ছাড়িল ; শেষে একা ননীগোপাল যেন মরণ পণ করিয়া বসিল।

দিনের পর দিন কাটিয়া গেল, ননীগোপাল কঙ্কালের মত শীর্ণ হইয়া পড়িল, কিন্তু আপনার গোঁ ছাড়িল না। যখন সে দেড় মাসের অধিককাল অনশনক্লিষ্ট, তখনও তাহাকে দাঁড় করাইয়া হাতকড়িতে ঝুলাইয়া রাখিতে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্কোচ বোধ হয় নাই। ফলে দেখিতে দেখিতে আবার Hunger strike ছড়াইয়া পড়িল এবং কর্ত্তৃপক্ষের শত সাবধানতা সত্ত্বেও ইন্দুভূষণ, উল্লাসকর, ননীগোপালের কথা দেশের কানে আসিয়া পৌছিল। সংবাদপত্রে সে বিষয় আলোচনার ফলে গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার Lukis সাহেবকে তদন্তের জন্য পোর্টব্লেয়ারে পাঠান। Lukis সাহেবের রিপোর্ট আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার রিপোর্টের ফলে উল্লাসকরকে মান্দ্রাজের পাগলা গারদে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং অপর সকলেও অল্পদিনের জন্য একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে।

ননীগোপালকেও অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাহার বন্ধুবান্ধবেরা আহার করিতে স্বীকৃত করান এবং ইহার অল্পদিন পরেই যাঁহারা তিন মাসের সাজা লইয়া জেলখানায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় তাঁহাদিগকে আবার জেলের বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

ধর্ম্মঘটের প্রথম পর্ব্ব এইখানেই সমাপ্ত হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিধি যাহার প্রতি বাম, তাহার মরিয়াও নিস্তার নাই। আমরা বাহিরে রহিলাম বটে, সুখে দুঃখে একরূপ দিন কাটিতে লাগিল, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আবার জেলখানা হইতে গোলমালের সংবাদ পাইলাম—'উৎপীড়িত হইয়া ননীগোপাল আবার কর্ম্মত্যাগ করিয়া বসিয়াছে!' শাস্তিস্বরূপ তাহাকে চটের কাপড় পরিতে দেওয়ায় সে তাহা পরিতে অস্বীকৃত হয়! জোর করিয়া তাহার জাঙ্গিয়া কাড়িয়া লইয়া তাহাকে কুঠরীর মধ্যে চটের জাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু সে **"Naked we came out of our mother's womb and naked shall we return**—'মায়ের পেট থেকে নগ্ন এসেছি, নগ্নই ফিরে যাব' এই মন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে চটের জাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়া উলঙ্গ হইয়া বসিয়া থাকে! গলার টিকিট ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেয়, চীফ কমিশনার কাছে আসিলে দাঁড়ায়ও না, সেলামও করে না। কি চাও জিজ্ঞাসা করিলে বলে—"কিছু চাই না" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছেলেটা কি শেষে পাগল হইয়া গেল?—এই ভাবনাই সকলের মনে উঠিল। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেল—না, জ্ঞান বেশ টন্‌টনে আছে। ইংরাজ যখন নিজের খুসিমত আইন-আদালত বানাইয়াছে, সে সকল ব্যবস্থার সহিত যখন তাহার দেশের লোকের কোনও সম্বন্ধ নাই, তখন কেন যে সে এই সমস্ত আইন ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ মাথা পাতিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য এ প্রশ্নের মীমাংসা লইয়াই ননীগোপাল ব্যস্ত। তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি যাহাতে সায় দেয় না, শুধু প্রাণটা বাঁচাইবার জন্য সে কেন সে কাজ করিতে যাইবে? প্রাণ রাখিতে রাখিতেই যেখানে প্রাণান্ত হইতে হয়, সেখানে প্রাণের মূল্য কতটুকু?

ভগবান্ যাহার মনের উপর স্বাধীনতার ছাপ লাগাইয়া দিয়াছেন, অতি বড় প্রচণ্ড শাসনকর্ত্তাও তাহার শরীরকে চিরদিন পরাধীন করিয়া রাখিতে পারে না, এই আশ্বাস ও অভয় ভিন্ন আমরা প্রশ্নের আর যে কি উত্তর দিব—তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না।

এদিকে আমাদেরও কপাল ভাঙ্গিল। কলিকাতার কাগজে এই সময় আন্দামানের রাজনৈতিক কয়েদীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল ; কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা - আমরাই সে সমস্ত সংবাদ পাঠাইতেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে আমরাও যে সকল বিষয়ে আইন-কানুন মানিয়া চলিতে পারিতাম তাহা নহে। পেটের জ্বালায় নানা স্থান ঘুরিয়া আমাদের ফলটা পাকড়টা ও মুখরোচক কিছু কিছু আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হইত, আর সাধারণ কয়েদীদের সহিত মেলা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই আমাদের লুকাইয়া লুকাইয়া বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিলে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত। কর্ত্তারা হয় তাহা বুঝিলেন না ; অথবা না বুঝিবার ভাণ করিয়া আমাদের বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—সে কথা ভগবানই জানেন।

একদিন সুপ্রভাতে চারিদিকে তল্লাসীর ধূমধাম পড়িয়া গেল। আমাদের থাকিবার বসিবার শুইবার সব স্থান পুলিসে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। মাণিকতলা বাগানের একটা প্রহসনাত্মক পুনরভিনয়—tempest in a tea pot হইয়া গেল। দুই একখানা বাজে চিঠি ও এক আধটা কবিতা ভিন্ন আর কিছুই মিলিল না কিন্তু চীফ কমিশনারের আদেশ মত আমাদের সকলকেই জেলে পাঠান হইল। ক্রমে নানারূপ গুজব শুনিতে লাগিলাম, আমরা নাকি বোমা বানাইয়া পোর্টব্লেয়ার উড়াইয়া দিয়া একখানা সরকারী steamer পাকড়াও করিয়া পলাইয়া যাইবার সংকল্প করিতেছিলাম ; আর অন্তর্য্যামী চীফ কমিশনার

লালমোহন সাহা নামক এক হিতৈষী কয়েদীর কথায় সেই আসন্ন বিপদ্ হইতে তাঁহার রাজ্যটীকে রক্ষা করিবার জন্য এই সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন! চীফ কমিশনার জেলে আসিলে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—'কর্ত্তা, ব্যাপারখানা কি? অধীনদের উপর এ অযথা আক্রমণ কেন?" কর্ত্তা নিতান্ত ভাল্ মানুষটীর মত বলিলেন—"আমি কিছুই জানি না। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যেরূপ আদেশ পাইয়াছি, সেইরূপ করিয়াছি।"

ভাল, এ কথার আর উত্তর কি! কিন্তু কিছুদিন পরে শুনিলাম—আমাদের সহিত মিশিত বা কথাবার্ত্তা কহিত বলিয়া বাহিরের অনেক লোককে সাজা দেওয়া হইতেছে, এবং পুলিসের একজন সাক্ষী কোথা হইতে গ্রামোফোনের পিন, লোহার টুকরা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া নিঃসংশয়ে আমাদের বোমা সৃষ্টির দুরভিসন্ধি প্রমাণ করিয়া ফেলিয়াছে। নারায়ণগড়ে লাট সাহেবের ট্রেণ ভাঙ্গা লইয়া যখন জনকতক নিরপরাধ লোক দণ্ডিত হয়. তখন হইতেই আমরা পুলিসের অপার মহিমার কথা বেশ জানিতাম। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমাদের বিরুদ্ধে যদি কোনও সন্দেহ বা প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে এইরূপ চোরাগোপ্তা চাল না চালিয়া আমাদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হয় না কেন?" কর্ত্তারা কিন্তু এ কথার কোনও উত্তর না দিয়াই মুখ টিপিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলাম।

মাস কয়েক পরে সার রেজিনাল্ড ক্র্যাডক্ (Sir Reginald Craddock) পোর্টব্লেয়ার পরিদর্শন করিতে যান। আমরা ভাবিলাম, খুব কাপ্তেন পাকড়াইয়াছি; এইবার আমাদের যা' হয় একটা ব্যবস্থা হইবে। তাঁহার নিকট দুঃখের কাহিনী আরম্ভ করিতে না করিতে চীফ কমিশনার নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "তোমরা বাহিরে রাজদ্রোহের পরামর্শ (Conspiracy) করিতেছিলে।"

আমরা জবাব দিলাম, "তাই যদি আপনার ধারণা, ত প্রথমে যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তখন ভাল মানুষ সাজিয়া 'জানি না' বলিয়াছিলেন কেন? আর সে কথা বলিবার পরে যদি আমাদের অপরাধের প্রমাণ পাইয়া থাকেন,ত প্রকাশ্য আদালতে আমাদের বিচার করিতে এত সঙ্কোচ বোধ করেন কেন?" সার রেজিনাল্ড মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন—"কি জান,—এ সব কথার প্রমাণ হয় না।"

ননীগোপালও তাহার সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিল; মহামান্য ক্র্যাডক সাহেব শুধু উত্তর করিলেন—"তুমি সরকারের শত্রু, তোমাকে মারিয়া ফেলাই উচিত ছিল।"

"তাই যদি উচিত, ত আইন-আদালতের এ ঠাট সাজাইয়া রাখিয়া বৃথা পয়সা খরচ কেন? কাজটা সংক্ষেপে সারিলেই ত ছিল ভাল।"

বিচার ত এইখানে সাঙ্গ হইয়া গেল। এখন উপায়? নিরুপায়ের যিনি উপায়, তিনি না মুখ তুলিয়া চাহিলে আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু এবার তাঁহারও সিংহাসন বুঝি টলিয়াছিল।

এক এক করিয়া প্রায় সকলেই পুনরায় কাজ-কর্ম্ম ছাড়িয়া দিল। জেলের কর্ত্তৃপক্ষ সাজা দিয়া যখন হাঁপাইয়া পড়িলেন, তখন যাঁহারা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত নন তাঁহাদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ডেপুটী কমিশনার Lowis সাহেবের উপর সেই ভার পড়িল। তিনি বিচারের পূর্ব্বে একদিন ধর্ম্মঘটের কারণ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়া অনুসন্ধান করিতে আসিলেন।

আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যে, আমাদের প্রতি সাধারণ কয়েদী অপেক্ষা ভাল ব্যবহার করা না হয়; এ বিষয়ে পোর্টব্লেয়ারের কাহারও

কোনও হাত নাই। "কিন্তু সাধারণ কয়েদীর যে সমস্ত সুবিধা আছে, আমাদের সে সমস্ত কিছুই নাই। সাধারণ কয়েদী লেখাপড়া জানিলে আফিসে ভাল কাজ-কর্ম্ম পায়; তাহারা লেখাপড়া না জানিলেও ওয়ার্ডার, পেটি অফিসার হইতে পারে, আমরা যে সে সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত। অপরে পাঁচ বৎসর পরে মাসে বারো আনা করিয়া মাহিনা পায় এবং দশ বৎসর পরে নিজে উপার্জ্জন করিয়া খাইতে পারে, আর আমাদের যে চিরদিনই জেলে পচিয়া মরিবার ব্যবস্থা!" Lowis সাহেব উত্তর করিলেন যে, এ সমস্ত ব্যবহার ও দায়িত্ব ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—"সাহেব, ভাল করিবার কোন অধিকারই তোমাদের নাই, শুধু কি সাজা দিবার অধিকারটুকুই হাতে রাখিয়াছিলে?"

সাহেব হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—"কি করিব? জেলের শান্তি, discipline ত রক্ষা করিতে হইবে।"

"ন্যায়ই হোক, অন্যায়ই হোক disciplineটা রক্ষা করিতেই হইবে, মোট কথা এই, না?"

সাহেব এ কথায় কোনও উত্তর দিলেন না। ব্যাপারটা কি তাহা তিনি বেশই জানিতেন; কিন্তু তিনিও ত সরকারী চাকর। তাই কাহারও এক মাস, কাহারও তিন মাস, কাহারও বা ছয় মাস সাজা বাড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। ভবিষ্যতে একবার ইঁহার সহিত আমাদের দেখা হইয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে উল্লাসকরের কথা উঠিলে তিনি বলেন—"Ullaskar is one of the noblest boys I have ever seen, but he is too idealistic।" "উল্লাসের মত মহাপ্রাণ ছেলে খুব কম দেখিয়াছি, তবে সে বড় বেশি উচ্চভাবপ্রবণ।" অথচ চাকরীর খাতিরে তাঁহাকে উল্লাসকরকে সাজা দিতেও হইয়াছিল।

Discipline আইন-কানুন রক্ষার জন্য ত সাজা, কিন্তু ক্রমশঃ সেই শান্তিরক্ষাই দায় হইয়া উঠিল। আমাদের দেখাদেখি সাধারণ কয়েদী-দের মধ্যেও ধর্ম্মঘটের দল বাড়িয়া উঠিল। জেলের কাজকর্ম্মের ক্ষতি হইতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষ দেখিলেন, একটা কিছু না করিলেই নয়।

রাজনৈতিক অপরাধীর মধ্যে যাঁহারা মেয়াদী কয়েদী (term convict) তাঁহাদের সাত আট জনকে হঠাৎ একদিন দেশের জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, এবং যে জেলার আমাদের গালাগালি দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, তিনিই একদিন নিতান্ত ভদ্রভাবে আমাদের ধর্ম্মঘট ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন—"Now you can retreat with honour" —"এখন তোমরা আপন সম্মান বজায় রেখে কাজে নেমে পড়তে পার"; তিনি নাকি সংবাদ পাইয়াছেন যে, অধিকাংশ মেয়াদী কয়েদীকে দেশের জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে; এবং যাঁহারা পোর্টব্লেয়ারে থাকিয়া যাইবেন তাঁহাদের কাজ-কর্ম্ম ও আহারাদির একটু বিশেষ ব্যবস্থা হইবে।

আমরা বলিলাম—"তথাস্তু, কিন্তু দুই মাসের মধ্যে যদি আপনাদের বিশেষ ব্যবস্থার নমুনা না দেখা যায়, তাহা হইলে পুনর্মূষিক হইয়া আমরাই বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া লইব।"

এইরূপে উভয় পক্ষে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ায় ধর্ম্মঘটের দ্বিতীয় পর্ব্ব সমাপ্ত হইল।

অল্পদিনের মধ্যে আলিপুরের বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র ও আমি, ঢাকার পুলিনবিহারী ও সুরেশচন্দ্র এবং নাসিকের সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয় ও যোশী ভিন্ন অপর সকলকে দেশের জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

মেয়াদী কয়েদীদিগকে যখন ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, তখন আমরা কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। যে ছয় সাত জন বাকি রহিলাম,

তাহাদের যখন পোর্ট ব্লেয়ারে থাকিতেই হইবে তখন আর বেশী গোলমাল করিয়া লাভ কি ? ছাড়া পাইবার যখন কোন আশাই নাই, তখন মরণের অপেক্ষায় শান্তভাবে দিন কাটানই ভাল !

কিন্তু অদৃষ্টে সে শান্তি আমাদের ছিল না। ১৯১৪ সালে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ভারতবর্ষে যে চাঞ্চল্যের স্রোত আসিয়া ধাক্কা মারিল, তাহার ফলে লাহোর ষড়যন্ত্রের উৎপত্তি ও 'গদর' দলের প্রায় পঞ্চাশ জনের পোর্টব্লেয়ারে আগমন। পল্টনের অনেক শিখ সিপাহীও রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত হইল। বাংলা দেশ হইতেও পনেরো ষোল জন আসিল। ফলে পোর্টব্লেয়ারের জেলখানা এবার রাজনৈতিক কয়েদীতে ভরিয়া এ সুখের নরক গুলজার হইয়া উঠিল। ইঁহাদের মধ্যে চার পাঁচ জন ভিন্ন অপর কাহাকেও ঘানি ঘুরাইতে দেওয়া হয় নাই; কিন্তু নারিকেলের ছোবড়া পেটাও বড় কম পরিশ্রম নহে। তাহার উপর আর এক উপসর্গ এই যে, সরকারী খোরাকে ইঁহাদের পেট ভরে না। একে ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া পাঞ্জাবী, তাহার উপর অনেকেই বহুদিন আমেরিকায় থাকার ফলে যথেষ্ট পরিমাণে মাংসাদি খাইতে অভ্যস্ত। সুতরাং দুইখানা রুটী ও এক বাটী ভাত ইঁহাদের পেটের এক কোণে কোথায় তলাইয়া যায় তাহার সন্ধানও পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্রও ইঁহারা নহেন। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণের সঙ্গে ইঁহাদের নরম গরম খটাখটি বাধিয়া উঠিল।

ঝান্সির পরমানন্দকে লইয়াই ঝগড়া আরম্ভ হইল। কি একটা কথা লইয়া তাঁহাকে জেলারের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। জেলার আপনার কর্ত্তৃত্ব জানাইয়া যে ওজনের কথা কহিলেন পরমানন্দও সেই ওজনের কথা ফিরাইয়া দিলেন। মুখোমুখি শেষে হাতাহাতিতে দাঁড়াইল।

বিচারে পরমানন্দের বিশ ঘা বেত্রদণ্ড হওয়ায় ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইল। কিন্তু তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইল না। জেলার নিজেই সকলকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া ভবিষ্যতে সদ্ব্যবহার করিবার আশা দিয়া সে ধর্ম্মঘট ভাঙ্গাইয়া দিলেন।

অসন্তোষের বীজ কিন্তু মরিল না। দিন কতক পরে সামান্য কারণে আবার গোলমাল বাধিল। রবিবারে কয়েদীদের ছুটী, সেদিন আপন আপন বস্ত্রাদি পরিষ্কার ভিন্ন অন্য কর্ম্ম হইতে তাহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পোর্টব্লেয়ারে কিন্তু সেদিন জেলের উঠানে ঘাস ছিঁড়িতে হয়। একে ত ছুটীর দিন সমস্ত দুপুর বেলা কয়েদীদিগকে কুঠরীর মধ্যে বদ্ধ থাকিতে হয়, তাহার উপর সকাল বেলা ঘাস ছিঁড়িয়া বেড়াইতে হইলে তাহাদের ছুটী নিতান্তই নামমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। আমেরিকার 'গদর' পত্রিকার সম্পাদক জগৎরাম প্রভৃতি কয়েকজন এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া রবিবারে ঘাস ছিঁড়িতে অস্বীকৃত হন। সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেবের বিচারে তাঁহাদের প্রত্যেকের ছয় মাস করিয়া বেড়ি ও কুঠরীবদ্ধ হওয়ার দণ্ড হয়। বলা বাহুল্য, লঘুপাপে এই গুরুদণ্ড দেখিয়া কেহই বিশেষ প্রীত হন নাই। তাহার পর, দিনের পর দিন যখন কষ্টের মাত্রা কমিবার কোনই সম্ভাবনা দেখা গেল না, তখন অনেকেই আবার কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। এই সময় একটা ব্যাপার লইয়া বড় গোলমাল হয়। একজন বৃদ্ধ শিখের সহিত জেলের প্রহরীদিগের বিবাদ হয়; তিনি বলেন যে, প্রহরীরা তাঁহাকে কুঠরীর মধ্যে লইয়া গিয়া অত্যন্ত প্রহার করে। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন, ফলে কিন্তু তিনি দুই এক দিনের মধ্যে কঠিন রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া হাসপাতালে আসেন। সেখানে যক্ষ্মারোগের সূত্রপাত হয় এবং অল্প-দিনের মধ্যেই তিনি মারা পড়েন। সেখানকার অনেকের বিশ্বাস যে,

গুরুতর প্রহারই তাঁহার মৃত্যুর কারণ, কিন্তু কর্তৃপক্ষ একথার সত্যতা অস্বীকার করেন। এই ব্যাপারের কোনও প্রতিকার হইল না ভাবিয়া চার পাঁচ জন আহার ত্যাগ করিলেন। পৃথ্বী সিং তাঁহাদের অগ্রণী। তাঁহাকে নাক দিয়া জোর করিয়া দুধ খাওয়াইয়া দেওয়া হইত। এ অবস্থায় তিনি পাঁচ মাস থাকেন। অন্যদেশে হইলে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া যাইত কিন্তু পোর্টব্লেয়ারের সংবাদ কে রাখে? সেখানে দুই দশ জন কয়েদী মরিলেই বা কাহার কি আসে যায়?

শিখদের মধ্যে আরও তিন চার জন এই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া দুই তিন মাস ভুগিয়া মারা যান। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জেলে ঢুকিবার সময় শ্যামদেশ হইতে ধৃত পণ্ডিত রামরক্ষার পৈতা কাড়িয়া লওয়া হয় বলিয়া তিনি আহার ত্যাগ করিয়াছিলেন; এই সময় যক্ষ্মারোগে তাঁহারও মৃত্যু হয়। অব্যাহতির অন্য কোন উপায় না দেখিয়া একজন একখণ্ড সিসা খাইয়াও মরিয়াছিলেন।

যাঁহারা মরিলেন তাঁহারা ত বাঁচিয়া গেলেন; যাঁহারা পাগল হইয়া জীবন্ত মরিয়া রহিলেন, তাঁহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। বালেশ্বর মোকর্দ্দমার যতীশচন্দ্র পাল তাঁহাদের অন্যতম! কুঠরীবদ্ধ অবস্থায় তিনি একেবারে উন্মাদ হইয়া যান। তাঁহাকে পাগলা গারদে পাঠান হয়; পরে ভারতবর্ষে লইয়া আসা হয়। এখন বহরমপুর পাগলা গারদে তাঁহার দিন কাটিতেছে।

এরূপ ঘটনার সংখ্যা নাই। কাহার কথা ছাড়িয়া কাহার কথা লিখিব? ছত্র সিংহ নামে একজন শিখ লায়লপুর খালসা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। দেশে তাঁহার অপরাধ কি জানি না; কিন্তু পোর্টব্লেয়ারে তাঁহাকে প্রথম হইতে কুঠরীবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়। ধর্ম্মঘট লইয়া

যখন গোলযোগ চলিতেছিল তখন তিনি একদিন উত্তেজিত হইয়া সুপারিনটেনডেণ্টকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করেন বলিয়া প্রবাদ। ফলে প্রহরীগণ তাঁহাকে মারিতে মারিতে অজ্ঞান করিয়া ফেলে। তাহার পর তাঁহাকে কুঠরীতে পোরা হয়; তাহা হইতে তাঁহাকে দুই বৎসরের অধিক কাল আর বাহির করা হয় নাই। বারান্দার এক কোণে জাল দিয়া ঘিরিয়া তাঁহার জন্য পিঁজরা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; সেই পিঁজরার মধ্যেই তাঁহাকে আহার, ভাঁড়ে শৌচ প্রস্রাবাদি ত্যাগ, রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতে হইত। ইহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া তাঁহাকে ক্রমে মরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য। আর একজন শিখ অমর সিংএরও ঐরূপ অবস্থা।

মৃত্যুর হার যখন ক্রমে বাড়িতেই চলিল তখন কর্তৃপক্ষদিগের একটু হুঁস হইল। অনেককে অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ (দড়ি পাকান) দেওয়া হইল। জগতরাম বহুদিবস পৃথক-কারাবাসের (separate confinement) ফলে শিরোরোগে ভুগিতেছিলেন, তাঁহাকে ও অপর দুই এক জনকে ছাপাখানার কাজ দেওয়া হইল। দয়ানন্দ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ভাই পরমানন্দ ধর্ম্মঘটে কখনও যোগ দেন নাই বলিয়া তাঁহাকে হাসপাতালে কম্পাউণ্ডার করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু অধিক দিন সে সুখ তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল না। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার চিঠি হইতে এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া সংবাদপত্রে রাজনৈতিক কয়েদীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়া পাঠান। চীফ কমিশনার ইহাতে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া পরমানন্দকে বিনা বিচারে হাজতে বন্ধ করিলেন। পরমানন্দ বলেন যে, তাঁহার এই চিঠি যথারীতি জেলের সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেবের হাত দিয়া পাস হইয়া গিয়াছিল। সে কথা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই, কিন্তু তথাপি পরমানন্দ

লাঞ্ছনা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। সকলেই একটা অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মঘটের ফলে সরকার বাহাদুরের সঙ্গে আমাদের যে রফা হইল তাহার মোদ্দা কথা এই যে, আমাদের চৌদ্দ বৎসর কালাপানির জেলে বদ্ধ থাকিতে হইবে। চৌদ্দ বৎসরের পর আমাদের জেলের বাহিরে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে আর তখন আমাদিগকে কয়েদীর মত পরিশ্রম করিতে হইবে না। জেলখানার ভিতরেও আমরা বাহিরের কয়েদীর মত নিজের নিজের আহার রাঁধিয়া খাইতে পারিব ও বাহিরের কয়েদীর মত পোষাক পরিতে পারিব অর্থাৎ জাঙ্গিয়া, টুপি ও হাতকাটা কুর্ত্তা না পরিয়া কাপড় ও হাতাওয়ালা কুর্ত্তা পরিতে পাইব আর মাথায় একটা চার হাত লম্বা কাপড়ের পাগড়ী জড়াইবার অধিকার পাইব। অধিকন্তু দশ বৎসর যদি আমরা ভাল ব্যবহার করি অর্থাৎ ধর্ম্মঘটে যোগ না দিই বা জেলের কর্ত্তাদের সহিত ঝগড়া না করি তাহা হইলে দশ বৎসর কয়েদ খাটিবার পর সরকার বাহাদুর বিবেচনা করিবেন আমাদের আরও অধিক সুখে রাখিতে পারেন কি না! জাঙ্গিয়া ছাড়িয়া আট হাতি মোটা কাপড় পরিয়া বা মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া আমাদের সুখের মাত্রা যে কি বাড়িয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে নিজের হাতে রাঁধিবার অধিকার পাইয়া প্রত্যহ কচুপাতা সিদ্ধ খাইবার দায় হইতে কতকটা অব্যাহতি পাইলাম! সঙ্গে সঙ্গে কঠিন পরিশ্রমের হাতও এড়াইলাম। বারীন্দ্রকে বেতের কারখানার তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হইল; হেমচন্দ্রকে পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ করা হইল আর আমি

হইলাম ঘানি-ঘরের মোড়ল। প্রাতঃকাল ১০টা হইতে ১২টার মধ্যে রন্ধন ও আহারাদি শেষ করিয়া লইবার কথা; কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যে সব কাজ সারিয়া লওয়া অসম্ভব দেখিয়া আমরা সাধারণ ভাণ্ডারা (পাকশালা) হইতে ভাত ও ডাল লইতাম; শুধু তরকারিটা নিজেদের মনোমত রাঁধিয়া লইতাম। রন্ধন-বিদ্যায় হেমচন্দ্রের ওস্তাদ বলিয়া নামডাক ছিল। প্রকৃতপক্ষে মাংস, পোলাও প্রভৃতি নবাবী খানা তিনি বেশ রাঁধিতে পারিতেন, তবে সোজাসুজি তরকারি রাঁধিতে আমাদের চেয়ে বেশী পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। একদিন একটা মোচা পাইয়া বহুকাল পরে মোচার ঘণ্ট খাইবার সাধ হইল। কিন্তু কি করিয়া রাঁধিতে হয় তাহাতে জানি না। মোচার ঘণ্ট রাঁধিবার জন্য যে প্রকাণ্ড কনফারেন্স বসিল তাহা ত রন্ধনপ্রণালী সম্বন্ধে কাহারও সহিত কাহারও মত মিলিল না। বারীন্দ্র বলিল—"আমার দিদিমা হাটখোলার দত্তবাড়ীর মেয়ে এবং পাকা রাঁধুনী, সুতরাং আমার মতই ঠিক।" হেমচন্দ্র বলিল—"আমি ফ্রান্সে গিয়ে ফরাসী রান্না শিখে এসেছি, সুতরাং আমার মতই ঠিক।" আমাদের সব স্বদেশী কাজেই যখন বিদেশী ডিপ্লোমার আদর অধিক তখন আমরা স্থির করিলাম যে, মোচার ঘণ্ট রান্নাটা হেমদাদার পরামর্শ মতই হওয়া উচিত। আমি গম্ভীর ভাবে রাঁধিতে বসিলাম, হেমদা কাছে বসিয়া আরও গম্ভীর ভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। কড়ার উপর তেল চড়াইয়া যখন হেমদা পেঁয়াজের ফোড়ন দিয়া মোচা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন তখন তাঁহার রন্ধন-বিদ্যার ডিপ্লোমা সম্বন্ধে আমার একটু সন্দেহ হইল। মোচার ঘণ্টে পেঁয়াজের ফোড়ন কি রে বাবা? এযে বেজায় ফরাসী কাণ্ড! কিন্তু কথা কহিবার উপায় নাই। চুপ করিয়া তাহাই করিলাম। মোচার ঘণ্ট রান্না হইয়া যখন কড়া হইতে নামিল

তখন আর তাহাকে মোচার ঘণ্ট বলিয়া চিনিবার জো নাই। দিব্য তোফা কাল রং আর চমৎকার পেঁয়াজের গন্ধ! খাইবার সময় হাসির ধূম পড়িয়া গেল। বারীন্দ্র বলিল—"হাঁ, দাদা একটা ফরাসী chef-de cuisine বটে; দিদিমা আমার এমনটী রাঁধিতে পারিত না।" হেমদা হটিবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন—"ঐ ত তোমাদের রোগ! তোমরা সবাই দিদিমা-পন্থী। দিদিমা যা করে গেছেন তা আর বদ্‌লাতে চাও না।" মোচার ঘণ্ট যে দিন রন্ধনের গুণে মোচার কাবাব হইয়া দাঁড়াইল, তাহার দিন কতক পরে একবার সুক্ত রাঁধিবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল। কিন্তু সুক্ত রাঁধিবার সময় কি কি মসলা দিতে হয় সে বিষয়ে মতদ্বৈধ রহিয়া গেল। হেমদা' বলিলেন যে তরকারীর মধ্যে এক আউন্স কুইনাইন মিক্‌চার ফেলিয়া দিলেই তাহা সুক্ত হইয়া যায়। আমাদের দেশের যে সমস্ত নবীনা গৃহিণী পাঁচ খণ্ড পাক-প্রণালী কোলে করিয়া রাঁধিতে বসেন তাঁহারা সুক্ত রাঁধিবার এই অভিনব প্রণালীটা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ব্যাপারটা যদি সত্য হয় তাহা হইলে এই ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দেশে তাঁহারা একাধারে আহার ও পথ্যের আবিষ্কার করিয়া অমর হইয়া যাইতে পারিবেন। দাদারও জয় জয়কার পড়িয়া যাইবে।

রাঁধিবার জন্য আমরা জেল হইতে কিছু কিছু তরকারী লইতাম, তবে তাহার মধ্যে চুবড়ী আলু আর কচুই প্রধান। কাজে কাজেই বাজার হইতে মাঝে মাঝে অন্য তরকারী আনাইয়া লইতে হইত। সরকার বাহাদুরের নিয়মানুযায়ী আমরা মাসিক বেতন পাইতাম বারো আনা। আমরা শারীরিক দুর্ব্বল ছিলাম বলিয়া জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদের প্রত্যেককে বারো আউন্স করিয়া দুধ দিয়া তাহার আংশিক মূল্য স্বরূপ মাসিক আট আনা কাটিয়া লইতেন। বাকি চার আনার উপর নির্ভর

করিয়া আমাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। কিছুদিন পরে জেলের মধ্যে একটা ছাপাখানা স্থাপন করিয়া বারীন্দ্রের উপর তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয় আর হেমচন্দ্রকে বই-বাঁধাই বিভাগের অধ্যক্ষ করিয়া দেওয়া হয়। সেই সময় সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেব উহাদের প্রত্যেককে মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া ভাতা দিবার জন্য চীফ কমিশনারের অনুমতি চান। পাঁচ টাকার নাম শুনিয়াই চীফ কমিশনার লাফাইয়া উঠিলেন। কয়েদীর মাসিক ভাতা পাঁচ টাকা। আরে বাপ! তাহা হইলে ইংরেজরাজ যে ফতুর হইয়া যাইবে! অনেক লেখালেখির পর মাসিক এক টাকা করিয়া বরাদ্দ হইল। যথা লাভ!

ক্রমে ক্রমে আমাদের রান্নাঘরের পাশে একটি ছোট পুদিনার ক্ষেত দেখা দিল; তাহার পর দুই চারিটা লঙ্কা গাছ, এক আধটা বেগুন গাছ ও একটা কুমড়া গাছও আসিয়া জুটিল। এ সমস্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যাপার ঘটিতে দেখিয়া জেলার মাঝে মাঝে তাড়া করিয়া আসিত; কিন্তু সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের মনের এক কোণে আমাদের উপর একটু দয়ার আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি এ সমস্ত ব্যাপার দেখিয়াও দেখিতেন না। জেলারের প্রতিবাদের উত্তরে বলিতেন—'এরা যখন চুপ চাপ করে আছে, তখন এদের আর পিছু লেগো না।' এরূপ দয়া প্রকাশের কারণও ঘটিয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষের আট ঘাট বন্ধ রাখিবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে দেশের খবরের কাগজে তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী প্রকাশ হইয়া পড়িত। তাহাতে তাঁহাদের মেজাজটা প্রথম প্রথম বিলক্ষণই উগ্র হইয়া উঠিত; কিন্তু শেষে অনেকবার ঠেকিয়া ঠেকিয়া তাঁহারাও শিখিয়াছিলেন যে কয়েদীকে বেশী খাটাইয়া লাভ নাই।

মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হইবার প্রবলতর কারণ জার্ম্মাণীর সহিত

ইংরাজের যুদ্ধ। যুদ্ধ বাধিবার অল্পদিনের মধ্যেই কর্ত্তাদের মুখ যেন শুকাইয়া গেল। কয়েদীদের তাড়া করিবার প্রবৃত্তি আর বড় বেশী রহিল না। অষ্ট্রীয়ার রাজপুত্রের হত্যাকাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া প্যারী নগরীর কুড়ি মাইলের মধ্যে জার্ম্মান সৈন্যের আগমন সংবাদ সবই আমরা জেলের ভিতরে বসিয়া পাইতেছিলাম। শেষে যখন এমডেন আসিয়া মাদ্রাজের উপর গোলা ফেলিয়া চলিয়া গেল তখন ব্যাপারটা আর সাধারণ কয়েদীর নিকট হইতে লুকাইয়া রাখা সম্ভবপর হইল না। ইংরেজের বাণিজ্য ব্যাপারের যে যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে তাহা কয়েদীদের বুঝিতে বাকি রহিল না। আগে পিপা পিপা নারিকেল ও সরিষার তৈল পোর্টব্লেয়ার হইতে রপ্তানী হইত, এখন সে সমস্তই গুদামে পচিতে লাগিল। জেলে ঘানি চালান বন্ধ হইয়া গেল। শেষে যখন কয়েদীর নিকট হইতে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া যুদ্ধের জন্য টাকা সংগ্রহ (war loan) করা হইতে লাগিল তখন পোর্টব্লেয়ারে গুজব রটিয়া গেল যে, ইংরাজের দফা এবার রফা হইয়া গিয়াছে। জেলের দলাদলি ভাঙ্গিয়া গিয়া শত্রুমিত্র সবাই মিলিয়া জার্ম্মানীর জয় কামনা করিয়া ঘন ঘন মালা জপিতে আরম্ভ করিল। জার্ম্মানীর বাদসা নাকি হুকুম দিয়াছে যে সব কয়েদীকে ছাড়িয়া দিতে হইবে! সাহেবদের আরদালীরা আসিয়া খবর দিতে লাগিল যে, আজ সাহেব সংবাদপত্র পড়িতে পড়িতে কাঁদিয়া ফেলিয়াছে, কাল সাহেব না খাইয়া বিছানায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। ঝাঁকে ঝাঁকে ভবিষ্যদ্বক্তা জুটিয়া গেল। কেহ বলিল পীর সাহেব স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, ১৯১৪ সালে ইংরেজের ভরা ডুবিবে, কেহ বলিল এ কথা ত কেতাবে স্পষ্টই লেখা আছে! মোটের উপর সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই একই আলোচনা চলিতে লাগিল।

কয়েদীদের মনের ভাব শেষে কর্ত্তৃপক্ষেরও অগোচর রহিল না। ইংরেজ যে যুদ্ধে হারিতেছে না এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য জেলের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আমাদিগকে বিলাতের 'টাইমস্' পত্রের সাপ্তাহিক সংস্করণ পড়িতে দিতেন। কিন্তু টাইমসের কথা বিশ্বাস করাও ক্রমে দায় হইয়া উঠিল। টাইম্‌সের মতে ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্য প্রত্যহ যত মাইল করিয়া অগ্রসর হইতেছিল মাস কতক পরে তাহা যোগ দিয়া দেখা গেল যে, তাহা সত্য হইলে ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্যদের জার্ম্মানী পার হইয়া পোলাণ্ডে গিয়া উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল; অথচ পোলাণ্ড ত দূরের কথা, রাইন নদীর কাছাকাছি হওয়ার কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। সাধারণ কয়েদীরা ইংরাজের স্বপক্ষে কোন কথা কহিলে একেবারে খাপ্পা হইয়া উঠিত। কর্ত্তারা যে মিথ্যা খবর ছাপাইয়া তাহাদের পট্টি দিতেছে এ বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ মাত্র ছিল না!

নূতন নূতন যে সমস্ত কয়েদী দেশ হইতে আসিতে লাগিল তাহারা নানা প্রকার অদ্ভুত গুজব প্রচার করিয়া চাঞ্চল্য আরও বাড়াইয়া তুলিল। এক দল আসিয়া আমাদের সংবাদ দিল যে তাহারা বিশ্বস্তসূত্রে দেশ হইতে শুনিয়া আসিয়াছে যে এমডেন পোর্টব্লেয়ারের জেলখানা ভাঙ্গিয়া দিয়া রাজনৈতিক কয়েদীদের লইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমাদিগকে সশরীরে সেখানে উপস্থিত দেখিয়াও তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহিল না যে গুজব মিথ্যা! তাহারা যে ভাল লোকের কাছে ও কথাটা শুনিয়াছে! শ্রুতির চেয়ে প্রত্যক্ষটা ত আর বড় প্রমাণ নয়!

ক্রমে পাঠান ও শিখ পল্টনের অনেক লোক বিদ্রোহের অপরাধে পোর্টব্লেয়ারে আসিয়া পৌছিল। তাহাদের কেহ কেহ ফ্রান্স, কেহ বা মেসোপোটেমিয়া হইতে আসিয়াছে। পাঠানদের মুখে মুখে এনভার

বে'র দৈব শক্তি সম্বন্ধে যে সব চমৎকার গল্প প্রচারিত হইতে লাগিল তাহা শুনিয়া কয়েদীদের বুক আশায় দশ হাত হইয়া উঠিল। এনভার যে তোপের সম্মুখে দাঁড়াইলে নাকি খোদার কোদ্‌রতে তোপের মুখ বন্ধ হইয়া যায়। তিনি আবার নাকি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া একদিন মুলতান সরিফে আসিয়া অচিরে জগদ্ব্যাপী মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা দিয়া গিয়াছেন। জার্ম্মানীর বাদশাও নাকি কল্‌মা পড়িয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

এ সব কথার প্রতিবাদ করিয়া কয়েদীদের বিদ্বেষভাজন হওয়া ছাড়া আর অন্য কোনও ফল নাই দেখিয়া আমরা চুপ করিয়া থাকিতাম। তবে যথাসম্ভব সত্য ব্যাপার জানিবার জন্য সংবাদপত্র জোগাড় করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলাম। গদর দলের শিখেরা পোর্টব্লেয়ারে কয়েদী হইয়া আসিবার পর পাছে জেলের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়, সেই ভয়ে জেলে পাহারা দিবার জন্য দেশী ও বিলাতী পল্টন আমদানি করা হইয়াছিল। বিলাতী পল্টনের মধ্যে আইরিশ অনেক ছিল। আর তাহারা যে ইংরেজের বিশেষ শুভার্থী ছিল তাহাও নয়। সুতরাং সংবাদপত্র সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব ছিল না। তা' ছাড়া নূতন নূতন যে সমস্ত রাজনৈতিক কয়েদী আসিতে লাগিল তাহাদের নিকট হইতেও দেশের অবস্থা বুঝিতে পারিতাম। এমডেন ধরা পড়িবার পরে একটা গুজব শুনিয়াছিলাম যে, ঐ জাহাজে যে সমস্ত কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছিল তাহার মধ্যে পোর্টব্লেয়ারের একটা প্ল্যান ছিল; বোধ হয় ভবিষ্যতে কোনরূপ আক্রমণের ভয় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য পোর্টব্লেয়ারে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল ও দুই চারিটা তোপের আমদানি করা হইয়াছিল।

পোর্টব্লেয়ারে মিলিটারী পুলিসের মধ্যে পাঞ্জাবীর সংখ্যাই অধিক,

এবং তাহাদের মধ্যে শিখও যথেষ্ট। পাছে গদর দলের শিখেরা মিলিটারি পুলিসের সহিত কোনরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধায়, এই চিন্তায় পোর্টব্লেয়ারের কর্ত্তারা যেন একটু চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই ভয়ে জেলের ভিতরকার শিখদিগের উপর তাঁহাদের ব্যবহার বেশ একটু কঠোর হইয়া দাঁড়াইত। একে ত আমেরিকা প্রত্যাগত শিখদিগের রুটী ও মাংস খাওয়া অভ্যাস; জেলের খোরাক খাইয়া তাহাদের পেটই ভরে না; তাহার উপর মাথার লম্বা লম্বা চুল ধুইবার জন্য সাবান ও সাজিমাটী কিছুই পায় না। শেষে যখন তাহাদের উপর ছোট ছোট অত্যাচার সুরু হইল তখন তাহাদের মধ্যে ছত্র সিং ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সুপারিনটেনডেণ্টকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে। বেচারীকে তাহার ফলে দুই বৎসর কাল পিঁজরার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়। ধর্ম্মঘটও পুনরায় আরম্ভ হইল। কিন্তু যে সকল নেতা শিখদিগকে ধর্ম্মঘট করিবার জন্য উত্তেজিত করিলেন তাঁহারাই কার্য্যকালে সরিয়া দাঁড়াইলেন। শেষে দলাদলির সৃষ্টি হইয়া ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া গেল। যুদ্ধ থামিয়া গেলে আমাদের ভাগ্যবিধাতা আমাদের জন্য কোন নূতন ব্যবস্থা করেন কি না তাহাই দেখিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া রহিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক মতামত লইয়া মাঝে মাঝে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের সহিত আমাদের তর্ক-বিতর্ক হইত। বলা বাহুল্য, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের মহিমা প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোক ও রাজপুরুষের সহিত তর্ক উপস্থিত হইলে হারিয়া যাওয়াই ভদ্রতাসঙ্গত ; কিন্তু সে কথা জানিয়াও আমরা মাঝে মাঝে দুই চারিটা অপ্রিয় সত্য কথা বলিয়া ফেলিতাম। যেখানে গায়ের ঝাল মিটাইবার অন্য উপায় নাই, সেখানে জিহ্বা সঞ্চালন ভিন্ন আর কি করা যায় ?

রুসিয়ায় তখন বিপ্লব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, একদিন জেলার আমায় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট যে তোমাদের সঙ্গে অতক্ষণ ধরিয়া তর্কবিতর্ক করেন, তা'র কি কারণ বলিয়া মনে হয় ?"

আমি বলিলাম—"কি জানি, সাহেব ? স্বজাতির গুণগান করা ছাড়া আর যদি কোন গূঢ় উদ্দেশ্য থাকে ত বলিতে পারি না।"

জেলার বলিলেন—"এ কথা বোধ হয় জান যে ছয় মাস অন্তর ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের কাছে তোমাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে এক একখানি করিয়া রিপোর্ট যায়। তোমরা সুপরিন্‌টেন্‌ডেণ্টের কাছে যে মতামত প্রকাশ কর তিনি সেগুলি নোট করিয়া রাখেন, আর তাহার উপর নির্ভর করিয়াই রিপোর্ট প্রস্তুত হয়। চারিদিকে যেরূপ হুলুস্থূল কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে, তাহাতে ইংরেজ যদি হারে, ত ল্যাঠা চুকিয়াই গেল; আর যদি জয়ী হয় ত আনন্দের প্রথম ধাক্কায় তোমাদের ছাড়িয়াও দিতে পারে। ইংরেজ রাজত্বটা যে কি, তাহা আমি আইরিশ, সুতরাং ভাল

করিয়া বুঝি। জেলখানার ভিতর সব সময়ে পেটের কথা মুখে আনিয়া লাভ নাই।”

ভাবিয়া দেখিলাম, কথাগুলো ত ঠিক। জেলখানাটা ঠিক বক্তৃতা দিবার জায়গা নয়। শত্রুর মুখ হইতেও উপদেশ শাস্ত্রমত গ্রাহ্য; সুতরাং জিহ্বাটা সেই সময় হইতে অনেক কষ্টে সংযত করিয়া ফেলিলাম।

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট মাঝে মাঝে যুদ্ধের বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন। জার্ম্মানী যে কি ভীষণ রকম পাজি তাহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য। আমারাও এক বাক্যে জার্ম্মানীর পাজিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাকে জানাইয়া দিলাম যে মরিবার পর জার্ম্মানী নিশ্চয় নরকে যাইবে। দেবলোকে ইংরাজের পার্শ্বে স্থান পাইবার তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই।

ইংরাজচরিত্রে একটা কেমন সঙ্কীর্ণতা আছে—সে কোন জিনিসের নিজের দিক ছাড়া পরের দিক সহজে দেখিতে পায় না। তেত্রিশ কোটী ভারতবাসী যে চিরদিন ইংরেজের আশ্রয়েই থাকিতে চায়, এ কথা বিশ্বাস করিবার জন্য ইংরেজের প্রাণ একেবারেই লালায়িত! ভারতে ইংরেজ রাজত্ব যে আদর্শ শাসনযন্ত্রের খুব কাছাকাছি এ বিষয়ে তাঁহাদের বড় একটা সন্দেহ নাই।

কিন্তু এ বিশ্বাস সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেবের শেষ পর্য্যন্ত ছিল বলিয়া মনে হয় না। যুদ্ধের সময় ত বেচারা প্রাণপণ করিয়া পরিশ্রম করিলেন, কয়েদীর খরচ কমাইয়া সরকারী তহবিলে অনেক টাকা জমা দিলেন; কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইবার পর নিজের একমাত্র শিশু কন্যাকে বিলাতে রাখিয়া আসিবার জন্য যখন ছয় মাসের ছুটী চাহিলেন তখন ছুটী আর মিলিল না। আবেদনের পর আবেদনের যখন কোনও উত্তর পাওয়া

গেল না তখন তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—"All governments are bad, I am an anarchist. শেষে চটিয়া গিয়া তিনি চাকরী ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া বলিলেন—"The gods of Simla are incorrigible।" কিছুদিন পূর্ব্বে মণ্টেগু সাহেবের রিফর্ম বিলের খসড়ায় যখন ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে একেবারে সর্ব্বময় প্রভু করিয়া খাড়া করা হইয়াছিল, তখন ঐ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টই একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"তাহাতে কোন দোষ হইবে না। The Government of India are sensible people," নিজের লেজে পা না পড়িলে কেহ পরের দুঃখ বুঝিতে পারে না।

যাক্—এ দিকে যুদ্ধ ত শেষ হইয়া গেল। যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন ছাড়া পাইবার আশা ভরসা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া মরণের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলাম তখন দুঃখের মাঝখানে দিন একরূপ কাটিয়া যাইতেছিল; কিন্তু যুদ্ধের পর আবার কয়েদী ছাড়িবার কথা উঠিল। তখন আশা ও আশঙ্কায় দিন কাটান ভার হইয়া উঠিল। একদিন সংবাদ আসিল যে, যে সমস্ত যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক কয়েদী পিনাল কোডের ৩০২ ধারা অনুসারে অপরাধী নয় তাহারা জেলখানায় যদি সাত বৎসর কাটাইয়া থাকে ত তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে। আমাদের সাত বৎসর ছাড়িয়া দশ বৎসর হইয়া গিয়াছে, সুতরাং প্রাণে একটু আশার সঞ্চার হইল। কিছুদিন পরে শুনিলাম যে, যে সমস্ত কয়েদীর মুক্তির জন্য ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের কাছে নাম পাঠান হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে আমাদের নামও গিয়াছে; এখন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিলেই নাকি আমরা নাচিতে নাচিতে দেশে ফিরিয়া যাইতে পারি।

এ পর্য্যন্ত কোনও যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক কয়েদী পোর্টব্লেয়ার হইতে বাঁচিয়া ফিরে নাই। ১৮৫৭ সালে যাহারা সিপাহী

বিপ্লবের পর পোর্টব্লেয়ারে গিয়াছিল তাহাদের সকলকেই সেখানে একে একে দেহরক্ষা করিতে হইয়াছে। থিবর সহিত যুদ্ধের পর যে সমস্ত ব্রহ্মদেশীয় কয়েদী আসিয়াছিল তাহারাও কেহ ছাড়া পায় নাই। আজ আমাদের জন্য যে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে একথা সহসা বিশ্বাস করিতে সাহস হইল না। কিন্তু না বিশ্বাস করিয়াই বা করি কি? প্রাণ যে ফুলিয়া ফুলিয়া হাঁপাইয়া উঠিতেছে!

ক্রমে জার্ম্মানীর সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। ইংলণ্ডে বিজয় উৎসব ফুরাইয়া গেল। কিন্তু কই, কয়েদী ত ছাড়িল না। যুদ্ধ বন্ধ হইবার পর হইতেই দিন গণনা আরম্ভ করা গিয়াছে; দিন গণিতে গণিতে সপ্তাহ, সপ্তাহ গণিতে গণিতে মাস, ক্রমে মাস গণিতে গণিতে বৎসর ফুরাইয়া গেল; কিন্তু বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িল না। খবরের কাগজে কিন্তু পড়িয়াছিলাম যে অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষে বিজয় উৎসব হইবে সুতরাং মনের কোণে একটু আশা রহিয়া গেল।

ভারতে যখন বিজয় উৎসব ফুরাইয়া গেল তখন মনটা ছট্‌ফট্ করিতে আরম্ভ করিল—খবর বুঝি এই আসে, এই আসে! শেষে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে খবরও একদিন আসিল। সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আমাদের অফিসে ডাকাইয়া শুনাইয়া দিলেন যে সরকার বাহাদুর কৃপা-পরবশ হইয়া আমাদিগকে বৎসরে একমাস করিয়া মাফ দিয়াছেন।—ব্যোম ভোলানাথ! এত দিনের আশা এক ফুৎকারে উড়িয়া গেল!

তখন দেখিলাম যে পোর্টব্লেয়ারে জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটান ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই। তাই যদি করিতে হয় ত ভূতের বেগার আর খাটিয়া মরি কেন? চীফ কমিশনারের নিকট আবেদন করিলাম যে সমস্ত মাফ লইয়া যখন আমাদের চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে তখন সরকারী প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমাদের জেলের কাজকর্ম্ম হইতে

অব্যাহতি দেওয়া হোক। কিন্তু সে আবেদন-পত্র যে চীফ কমিশনারের দপ্তরে গিয়া কোথায় ধামা চাপা পড়িয়া গেল তাহার আর কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

এই সময় জেল কমিটির পোর্টব্লেয়ারে আসিবারে কথা ছিল। আমি স্থির করিলাম যে আমাদের যা কিছু বক্তব্য সমস্ত জেল কমিটির নিকট গায়ের ঝাল ঝাড়িয়া বলিয়া দিয়া তাহার পর কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িব। কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে? জেল কমিটি চলিয়া যাইবার অল্প দিন পরেই একদিন প্রাতঃকালে সুপারিন্‌টেনডেণ্ট আসিয়া আমাদের সংবাদ শুনাইয়া দিলেন যে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট আমাদের আলীপুর জেলে পাঠাইয়া দিবার আদেশ দিয়াছেন; সেখান হইতে আমাদের মুক্তি দেওয়া যাইবে।

অল্পদিনের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের মতিগতি কি করিয়া পরিবর্ত্তিত হইল সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার কৌতূহল মনের মধ্যেই চাপা পড়িয়া রহিল। লম্বা হইয়া মেজের উপর পড়িয়া স্ফূর্ত্তিতে কেহ চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল, কেহ বা গান জুড়িয়া দিল। একজন বিজ্ঞ বন্ধু সকলকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন—"একটু স্থির হও, দাদারা; এ বাড়ীতে ফলার করতে এলে না আঁচানো পর্য্যন্ত বিশ্বাস নেই। শেষে মাঝ দরিয়ায় না জাহাজ ডুবিয়ে দেয়।"

জাহাজে চড়িবার আর দুই দিন বাকী। রাত্রে চোখে নিদ্রা নাই। আহারে প্রবৃত্তি নাই। কল্পনার শত চিত্র চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। বহুদিন বিস্মৃত সুপরিচিত মুখগুলি আবার মনের মধ্যে ফুটিতেছে। যাহাদের সহিত ইহকালের সব বন্ধন কাটিয়া গিয়াছিল তাহারা আবার স্নেহের শতডোরে বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দুই দিন কাটিয়া গেল। দল বাঁধিয়া ছাব্বিশ জন জেল হইতে বাহির

হইলাম। তখনও কাহারও কাহারও পায়ে বেড়ী বাজিতেছে। জেলের বাহির হইয়াই শিখেরা আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওয়া গুরুজী কি ফতে।" তাহার পর গান আরম্ভ হইল!—

ধন্য ধন্য পিতা দশমেস গুরু
যিন চিড়িয়াঁসে বাজ তোড়ায়ে—"

(হে পিতঃ, হে দশম গুরু! চটক দিয়া তুমি বাজ শিকার করাইয়াছিলে; তুমি ধন্য!)

আজ আবার চটক দিয়া বাজ শিকার করিবার দিন আসিয়াছে তাই ঐ সঙ্গীতের তালে তালে আমাদের প্রাণও নাচিয়া উঠিল! মনে মনে বলিলাম—"হে ভারতের ভাবী গুরু, হে ভগবানের মূর্ত্তপ্রকাশ, সমুদ্র পার হইতে তোমার দীন ভক্তের প্রণাম গ্রহণ কর।"

তাহার পর জাহাজে চড়িয়া একবার পোর্টব্লেয়ারের দিকে শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম। Wordsworthএর কবিতা মনে পড়িল—"What man has made of man."

জাহাজ তিন দিন ধরিয়া ছুটিয়াছে; মনটা তাহার আগে আগে ছুটিয়াছে। ঐ সাগর দ্বীপে বাতি জ্বলিতেছে, ঐ রূপনারায়ণের মোহানা! আজই খিদিরপুরের ঘাটে জাহাজ গিয়া পৌঁছিবে!

নাঃ—জাহাজ ত কৈ ডুবিল না। এ যে সত্য সত্যই ঘাটে আসিয়া লাগিল। পুলিস প্রহরী আমাদের সঙ্গে লইয়া আলীপুরের জেলের দিকে চলিল।

আবার আলীপুরের জেল—কিন্তু সে চেহারা আর নাই। আমাদের শুভাগমন বার্ত্তা সুপারিন্‌টেনডেণ্ট সাহেবের কাছে গেল। আমাদের কাছে যা কিছু জিনিস-পত্র ছিল প্রহরীরা আসিয়া তাহা বুঝিয়া লইল। বড় বিশেষ কিছু ছিলও না। পোর্টব্লেয়ার হইতে আসিবার সময় বইটই

সমস্ত নূতন নূতন ছেলেদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া আসিয়াছিলাম! স্থির করিয়াছিলাম দেশে ফিরিয়া আর মা সরস্বতীর সহিত কোন সম্বন্ধ রাখা হইবে না। চুপ করিয়া শুধু দুটি ভাত খাইব আর পড়িয়া থাকিব।

ঘণ্টা খানেক জেলে থাকিবার পর সুপারিন্‌টেনডেণ্ট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন শনিবার। আমরা ভাবিয়াছিলাম সেদিন ও তাহার পরদিন বুঝি আমাদের জেলেই থাকিতে হইবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা বোধ হয় আজই বাহিরে যাইতে চাও? কলিকাতায় তোমাদের থাকিবার জায়গা আছে?" বাহিরে যাইবার নাম শুনিয়া আমরা লাফাইয়া উঠিলাম। মুখে বলিলাম—"জায়গা যথেষ্ট আছে, আর মনে মনে বলিলাম—"জায়গা না পাই রাস্তায় শুয়ে থাকবো; একবার ছেড়ে ত দাও।"

সে রাত্রে হেমচন্দ্র, বারীন্দ্র ও আমি ছাড়া পাইলাম। কিন্তু যাই কোথায়? শ্রীযুক্ত সি, আর, দাসের বাড়ী গিয়া দেখিলাম তিনি বাড়ীতে নাই; তখন সেখান হইতে ফিরিয়া হেমচন্দ্রের বন্ধু হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায়ের বাড়ীতে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। হেমচন্দ্র ও বারীন্দ্র সে রাত্রে সেইখানেই রহিয়া গেল। আর আমি চন্দননগরে বাড়ী যাওয়াই স্থির করিলাম। ভাবিলাম রাত ১০৷৷০ টার সময় হাবড়া ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণ ধরিব।

কিন্তু বাড়ীর বাহির হইয়া দেখিলাম যে কলিকাতার রাস্তাঘাট সব ভুলিয়া গিয়াছি। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া হাজির হইলাম, তখন ট্রেণ ছাড়িয়া গিয়াছে। ভবানীপুরে ফিরিয়া যাইবার আর প্রবৃত্তি হইল না। শ্যামবাজারে শ্বশুরবাড়ী—ভাবিলাম সেইখানে গিয়া রাতটা কাটাইয়া দিব। শ্যামবাজারে যখন পৌছিলাম, তখন রাত বারোটা

বাজিয়া গিয়াছে। বাড়ীর দরজা বন্ধ। দুই চারিবার কড়া নাড়িয়া যখন কোন সাড়া পাইলাম না, তখন ভাবিলাম "কুচ পরোয়া নেহি; আজ রাতটা কলিকাতার রাস্তায় না হয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইব।" প্রাণে একটা নূতন রকম আনন্দের দেখা দিল। আজ বারো বৎসর পরে খোলা রাস্তায় ছাড়া পাইয়াছি। সঙ্গে জেলার নাই, পেটি অফিসার নাই, একটা ওয়ার্ডার পর্য্যন্ত নাই! অতীতের বন্ধন কাটিয়া গিয়াছে, নূতন বন্ধন এখনও দেখা দেয় নাই। আজ সংসারে বাস্তবিকই আমি একা। কিন্তু এই একাকিত্ববোধের সঙ্গে কোন বিষাদের কালিমা জড়িত নাই, বরং একটা শান্ত আনন্দ উহার তালে তালে ফুটিয়া উঠিতেছে।

শ্যামবাজার হইতে সার্কুলার রোড ধরিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে রওনা হইলাম। বারো বৎসর জুতা পরা অভ্যাস নাই; সুতরাং আজ নূতন জুতায় পা একেবারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। জুতা খুলিয়া বগলে পুরিয়া চলিতে লাগিলাম। বগলে পুঁটুলী দেখিয়া রাস্তায় এক পাহারাওয়ালা ধরিয়া বসিল—কোথা হইতে আসিতেছি, কোথায় যাইব ইত্যাদি ইত্যাদি। একবার মনে হইল সত্য কথা বলিয়াই দিই যে আমি কালাপানির ফেরত আসামী; তাহা হইলে আর কিছু না হোক, থানায় একটু মাথা গুঁজিবার জায়গা পাওয়া যাইবে। তাহার পর ভাবিলাম আর সত্যনিষ্ঠার বাড়াবাড়ি করিয়া কাজ নাই। একবার সত্য কথা বলিতে গিয়া ত বারো বৎসর কালাপানি ঘুরিয়া আসিলাম। শেষে বলিলাম—"আমি কালীঘাট হইতে আসিতেছি, শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইব।" কনষ্টেবল সাহেব আমার বগলের পুঁটুলী পরীক্ষা করিয়া অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি উড়ে?" বহু কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলাম—"হাঁ"। তখন তাঁহার নিকট হইতে যাইবার অনুমতি পাইয়া তাঁহাকে একটা দীর্ঘ সেলাম দিয়া আবার রওনা হইলাম। সেই রাত্রে রাত

একটার সময় গাড়ী চড়িয়া যখন শ্যামনগরের ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন রাত দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। নৌকায় গঙ্গাপার হইয়া যখন নিজেদের পাড়ার ঘাটে আসিয়া নামিলাম, তখন রাত প্রায় তিনটা; রাস্তা-ঘাট একেবারে জনশূন্য; টিম টিম করিয়া রাস্তার মোড়ে মোড়ে এক একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলিতেছে। বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দেখিলাম, বাড়ীর চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। জানালায় ধাক্কা মারিয়া ভায়াদের নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে একটা জানালা খুলিয়া গেল আর ভিতর হইতে হর্ষোদ্বেগ-চঞ্চল একটী সুপরিচিত বামা-কণ্ঠে প্রশ্ন হইল—"তুমি কে?" সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জানালা খুলিয়া মা ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহার আশা সকলেই ছাড়িয়া দিয়াছে, সে যে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে এ কথা বিশ্বাস করিতে যেন কাহারও সাহসে কুলাইতেছে না।

বাড়ীর ভিতর চারিদিকে ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। এক পাল ছেলে আসিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে আমার চারদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কারা এরা? ইহাদের কাহাকেও যে চিনি না। একটি ছোট ছেলে একটু দূরে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র তাহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল— "এই আপনার ছেলে।" যাহাকে দেড় বৎসরের রাখিয়া গিয়াছিলাম, সে আজ তেরো বৎসরের হইয়াছে!

আবার নূতন করিয়া সংসারের খেলা-ঘর পাতিয়া বসিলাম।

ওগো খেয়াপারের কর্ণধার! এবার কোন্ কূলে পাড়ি দিবে?